বিশেষ আয়োজন
সোমবার, ১৭ অক্টোবর ২০২২

গ্র্যাজুয়েশন অ্যাপ্রোচ

প্রত্যয়ের ২০ বছর

দারিদ্র্য জয়
প্রেক্ষাপট ও উত্তরণের পদ্ধতি

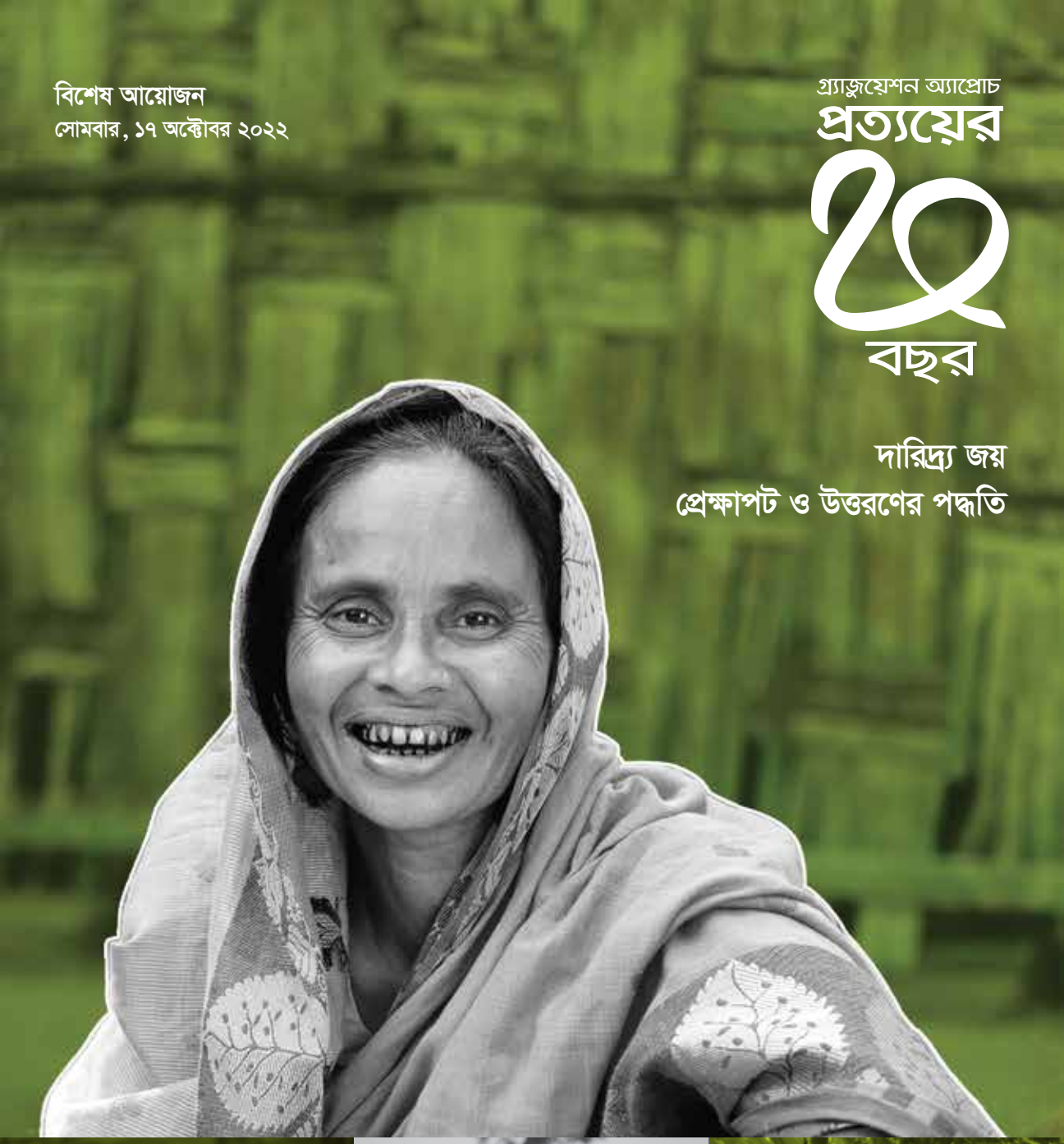

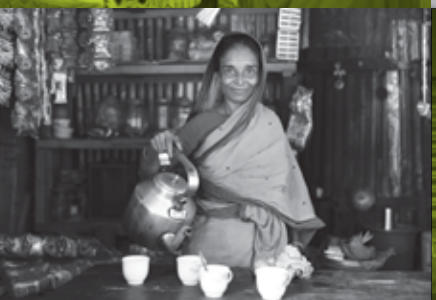

brac

50 from Bangladesh to the world

গ্র্যাজুয়েশন অ্যাপ্রোচ কী?

গ্র্যাজুয়েশন অ্যাপ্রোচ ব্র্যাক উদ্ভাবিত দারিদ্র্য বিমোচনের একটি কার্যকর এবং প্রমাণিত মডেল। এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সর্বাঙ্গীন সহায়তা প্রদান করা হয়। ফলে অতিদরিদ্র পরিবারের সদস্যদের সম্পদ, কর্মদক্ষতা এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়ে তাদের দারিদ্র্যমুক্তি এবং দীর্ঘমেয়াদে মানসিক ও আর্থসামাজিক অবস্থার টেকসই উন্নয়ন ঘটে।

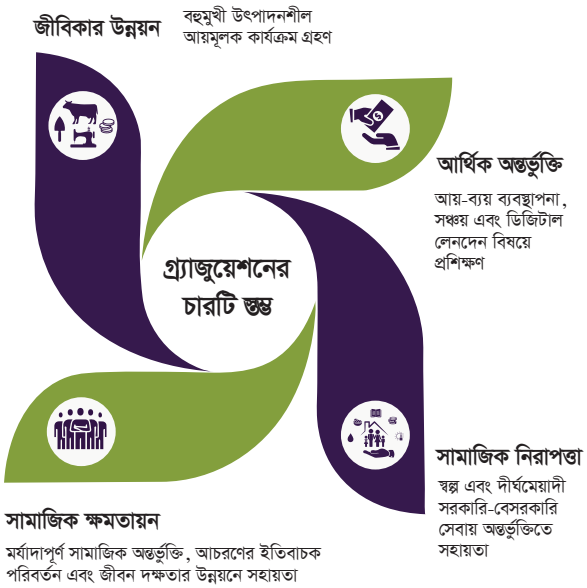

মৌলিক উপাদান

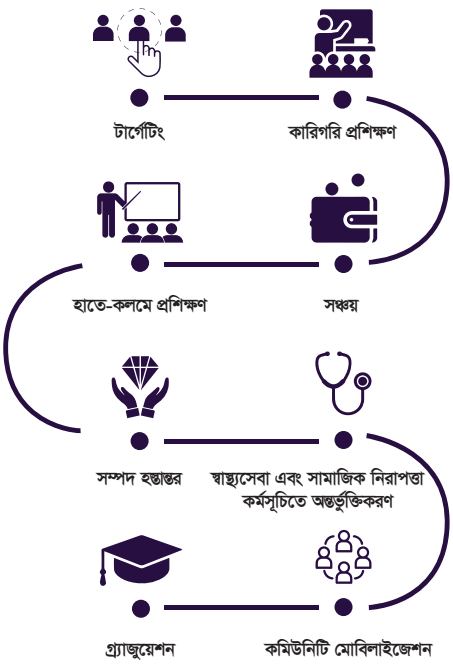

বিশ্বব্যাপী কার্যক্রম

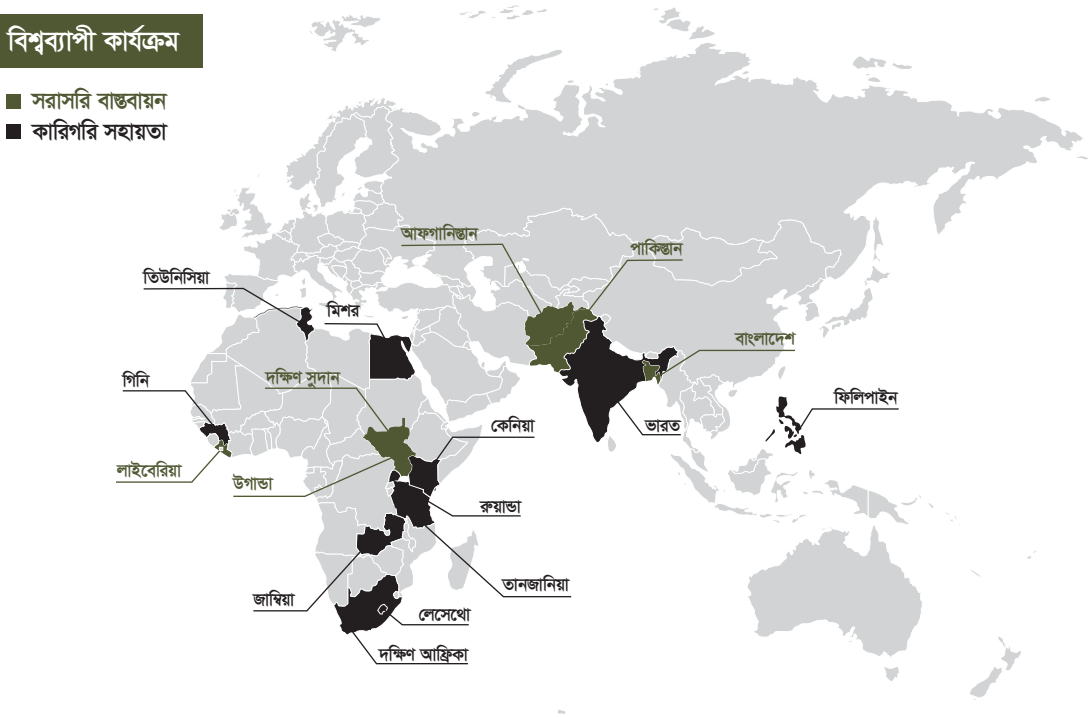

স্কেচ: রীশাম শাহাব তীর্থ, ব্র্যাক

মুখবন্ধ

গত পঞ্চাশ বছরে দারিদ্র্য বিমোচন এবং মানব উন্নয়নে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জন করেছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষেত্র এবং প্রেক্ষাপটেও নিত্যনতুন চ্যালেঞ্জ দেখা দিচ্ছে। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন ও নগরায়নের মতো নতুন প্রপঞ্চ। এরই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করার প্রচেষ্টায় নেতৃত্বদানকারী সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসহ অন্য অংশীদাররা নানাবিধ কৌশল প্রণয়ন করেছে। সেগুলোর ওপর ভিত্তি করে অনেক মৌলিক কর্মসূচির ডিজাইন ও সফল বাস্তবায়নও ঘটেছে। বিশ্বব্যাপী পরিচিত এবং প্রসারিত একটি কর্মসূচি হলো ব্র্যাকের আলট্রা-পুওর গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রাম। ব্র্যাক ২০০২ সালে বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনের একটি মডেল উদ্ভাবন করে, যা সারা বিশ্বে 'গ্র্যাজুয়েশন অ্যাপ্রোচ' নামে পরিচিত। আলট্রা-পুওর গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রামের এই মডেলটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে এখনও পর্যন্ত ২১ লাখ পরিবারকে টেকসইভাবে দারিদ্র্য জয় এবং সামাজিক ক্ষমতায়নে সহায়তা করা গেছে। ব্র্যাকের এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে বিশ্বের প্রায় ৫০টি দেশে সরকার, উন্নয়ন সংস্থা ও দাতাগোষ্ঠীসহ সংশ্লিষ্ট অংশীদাররা বিভিন্ন ভূপ্রাকৃতিক এবং আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে বসবাসরত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সফলতার সঙ্গে গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রামের বাস্তবায়ন ঘটাচ্ছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিশ্বের হাতে সময় আছে মাত্র আট বছর। এই সময়সীমার মধ্যে বাংলাদেশকে দারিদ্র্য এবং বৈষম্যমুক্ত করতে হলে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। এরই একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস হিসেবে ব্র্যাক ও বণিক বার্তা আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য বিমোচন দিবস ২০২২ (১৭ই অক্টোবর) এবং গ্র্যাজুয়েশন অ্যাপ্রোচের ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষে যৌথভাবে এই ক্রোড়পত্রটি প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশের প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ, গবেষক, সমাজকর্মী এবং গ্র্যাজুয়েশন অ্যাপ্রোচ উদ্ভাবন ও বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষভাবে যারা কাজ করেছেন, তাদের অমূল্য অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ এই ক্রোড়পত্রে তুলে ধরা হয়েছে। ক্রোড়পত্রের মাধ্যমে আগ্রহী পাঠক বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি এবং যে চ্যালেঞ্জগুলো দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমকে নিত্যনতুন চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে, সেগুলো সম্পর্কে জানতে পারবেন। একইসঙ্গে গ্র্যাজুয়েশন অ্যাপ্রোচ বাস্তবায়নের গত ২০ বছরের অভিজ্ঞতা, সাফল্য এবং বাংলাদেশে উদ্ভাবিত এই মডেলটি কীভাবে বিশ্বকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে, সে সম্পর্কেও বিস্তারিত ধারণা পাবেন। ■

প্রবন্ধ

দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশের অসামান্য অর্জন

ড. শামসুল আলম

একটা সময় ছিল, যখন দারিদ্র্যের সংজ্ঞার গভীরতা ও স্বরূপ বোঝাতে বাংলাদেশকে উদাহরণ হিসেবে দেখা হতো। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে অন্যতম দরিদ্র রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৭৩-৭৪ সালে বাংলাদেশে প্রথম খানা আয়-ব্যয় জরিপ করা হয় এবং এতে দেখা যায় জনসংখ্যার প্রায় ৮২ শতাংশ দরিদ্র। তখন মাথাপিছু আয় ছিল মাত্র ৯০ মার্কিন ডলার এবং এত কম মাথাপিছু আয় তখন একমাত্র ছিল আফ্রিকার দরিদ্রতম দেশ বুরকিনা ফাসোর।

গোটা পৃথিবীতেই একসময় জনসংখ্যার একটি বড় অংশই দরিদ্র ছিল। এমনকি গবেষণায় দেখা গেছে উনিশ শতকের প্রথমদিকে ৯০ শতাংশের বেশি মানুষেরই বাস ছিল দারিদ্র্যসীমার নিচে। কিন্তু গত দু'শ বছরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ফলে মানুষের জীবনযাত্রা ও জীবনধারায় আমূল পরিবর্তন এসেছে। তারপরও বিশ্ব ব্যাংকের হিসেবে দেখা যাচ্ছে, বিশ্বের ১০ শতাংশের মতো জনগোষ্ঠী এখনও দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। গোটা বিশ্বে দারিদ্র্য নিরসনের ক্ষেত্রে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (১৯৯০-২০১৫) অর্জিত হয়েছে। বাংলাদেশ নির্ধারিত সময়ের আগেই দারিদ্র্যের পরিমাণ অর্ধেকে নামিয়ে আনার লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর মূল দলিল 'ট্রান্সফর্মিং আওয়ার ওয়ার্ল্ড : দ্য ২০৩০ অ্যাজেন্ডা ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট'-এ স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে-সকল ক্ষেত্রে এবং মাত্রায় চরম দারিদ্র্যসহ দারিদ্র্যের মূলোৎপাটন বিশ্বের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এবং টেকসই উন্নয়নের অপরিহার্য শর্ত।

বাংলাদেশ সরকার এসডিজি-কে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পুরোপুরি প্রতিফলিত করেছে। সে অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা, কর্মসূচি ও সংস্কার কার্যক্রমও গ্রহণ করা হয়েছে। এতে দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে অদ্যাবধি গৃহীত অধিকাংশ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ছিল দারিদ্র্য নিরসন। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহীত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রথমটি ছিল দারিদ্র্য দূরীকরণ, পুনর্বাসন-পুনর্গঠন এবং অর্থনীতি পুনরুদ্ধারকল্পে বিশেষত কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি করা। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের মানুষের জন্য ত্রাণ বিতরণ ও পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে স্যার ফজলে হাসান আবেদের হাত ধরে ব্র্যাকের জন্ম। স্বাধীনতার পর থেকে দারিদ্র্য নিরসন এবং দরিদ্র, দুস্থ ও মেহনতি মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে সরকারের কার্যক্রমের সঙ্গে ব্র্যাকের কার্যক্রমের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। প্রথমদিকে শুধু খাদ্য সহায়তা থেকে ১৯৭৪ সালের খাদ্য সংকটের প্রেক্ষিতে কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা), আশির দশকের ত্রাণ উন্নয়ন (ভিজিডি), রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি, নব্বই দশকের শর্তযুক্ত নগদ অর্থ সহায়তা, বয়স্কভাতা, বিধবাভাতা, একুশ শতকের প্রথম দশকে উত্তরণ কর্মসূচি, ভৌগোলিক নির্বাচন ও কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা কর্মসূচির মাধ্যমে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে বিবর্তিত হয়েছে।

সরকার বর্তমানে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর পরিধি বাড়ানোর পাশাপাশি ক্রমোন্নতির দিকে ধাবিত হয়ে উত্তরণের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। বিশেষ করে মানব উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ, শিক্ষা উপবৃত্তি, আর্থিক সমৃদ্ধির জন্য সঞ্চয়, ক্ষুদ্রঋণ এবং পরবর্তীকালে সম্পদ হস্তান্তরের (আশ্রয়ন, একটি বাড়ি একটি খামার) মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমকে যুগোপযোগী করা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর প্রতিটি কর্মসূচি বিশেষ সময়ে ও বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রবর্তন করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে গৃহীত অনেকগুলো কর্মসূচির মধ্যে দ্বৈততা, সংখ্যাধিক্য, একাধিক সংস্থার অধীন বাস্তবায়িত হওয়ার মতো সমস্যাগুলোকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বাংলাদেশ এখন অনেক পরিণত অর্থনীতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। সেই বাস্তবতার আলোকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড জীবনচক্রভিত্তিক কাঠামোর আওতায় আনার জন্য সরকার ২০১৫ সালে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র গ্রহণ করে। প্রচলিত কর্মসূচিগুলোকে আরও কার্যকর করে তোলা এর উদ্দেশ্য। ওই খাতে বাজেট বরাদ্দের পরিসংখ্যান বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধির বদ্ধপরিকর অবস্থানকে আরও স্পষ্ট করে। ১৯৯৮ সালে বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে বরাদ্দ ছিল জিডিপি-র ১.৩ শতাংশ, ২০২১ সালে তা দাঁড়ায় ২.৩ শতাংশে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে তা হয়েছে জিডিপি-র ৩.১১ শতাংশ, যা মোট বাজেট ব্যয়ের ১৮ শতাংশ।

দারিদ্র্য দূরীকরণ কিংবা প্রশমিত করার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী একটি সামান্য উপায় মাত্র। শুধু সামাজিক নিরাপত্তা দিয়ে দারিদ্র্য জয় করা যায় না। তার জন্য দরকার দারিদ্র্যকে সকল নীতি, কৌশল, কার্যক্রম ও উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্ত করা। বাংলাদেশ সরকার ধারাবাহিকভাবে সেই প্রচেষ্টাই অব্যাহত রেখেছে। এখন জাতীয় বাজেটের অর্ধেকেরও বেশি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দারিদ্র্য নিরসনে ব্যয় হচ্ছে। মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে যেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হলো যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিদ্যুতায়ন ও এর ফলে অর্জিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। পার্বত্য এলাকা ও হাওর এলাকার কিছু অংশ বাদে বাংলাদেশের অধিকাংশ গ্রামে এখন সড়ক যোগাযোগের মাধ্যমে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে। সেইসঙ্গে সরকার শতভাগ বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করেছে। তা ছাড়া সরকার এখন মানব উন্নয়নে অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। বিশেষ করে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সরকার এখন কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ওপরেও জোর দিচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সরকার এখন জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর। এর ফলও আমরা দেখতে পাচ্ছি। বাংলাদেশ এখন আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রতিবেশী দেশ ভারত ও পাকিস্তানকে পেছনে ফেলেছে। নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ থেকে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার পথে রয়েছে আমাদের দেশ। স্বল্পোন্নত দেশের কাতার থেকে আমরা ২০২৬ সালে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হব। বিগত এক যুগ শক্তিশালী রাজনৈতিক

ছবি: প্রণব ঘোষ, ব্র্যাক

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ওপর বাংলাদেশ সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে

নেতৃত্বের গুণে বাংলাদেশ এখন এশিয়ার উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত।

২০১৯ সালে প্রকাশিত বিশ্ব ব্যাংকের বাংলাদেশ দারিদ্র্য মূল্যায়ন প্রতিবেদনে বাংলাদেশের দারিদ্র্য নিরসনের সাফল্যকে 'সঞ্জীবনী গল্প' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ২০০০ সালের পর থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত দারিদ্র্যের হার অর্ধেকে কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশ। এই সময়ের মধ্যে ২ কোটি ৫০ লাখ লোক দারিদ্র্যসীমা থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। তার মধ্যে ২০১০ থেকে ২০১৬ এই সময়ে ৮০ লাখ লোক দারিদ্র্যসীমা থেকে বেরিয়ে এসেছে। অর্থনীতির সকল খাত কমবেশি দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়তা করেছে। পাশাপাশি সামাজিক সূচকের অন্যান্য ক্ষেত্র যেমন : মানবপুঁজি বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠীর হার বৃদ্ধি, গড় প্রত্যাশিত আয়ু বৃদ্ধি, শিক্ষার ব্যাপকভিত্তিক প্রসার, নারীর উর্বরতা হার হ্রাস এবং শিশু মৃত্যুহার হ্রাস যুগপৎ দারিদ্র্য নিরসনে অবদান রেখেছে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ২০১০ সালের পর থেকে গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র্য হ্রাস মোট দারিদ্র্য হ্রাসে ৯০ শতাংশ ভূমিকা রেখেছে। সর্বশেষ জনশুমারি ২০২২ অনুসারে এখনও ৬৮.৪৯ শতাংশ লোক গ্রামে বাস করে। সরকার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে 'আমার গ্রাম আমার শহর' নীতি গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ গ্রামে শহরের সুবিধাদি নিশ্চিত করার মাধ্যমে গ্রাম ও শহরের ব্যবধান কমিয়ে আনা হচ্ছে।

বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিবেদনে যেমনটি বলা হয়েছে বাংলাদেশের উন্নয়ন ও দারিদ্র্য নিরসনের অভিজ্ঞতা গোটা বিশ্বের জন্য শিক্ষণীয় হতে পারে। এই সাফল্য অর্জনে সরকারের নীতি, কৌশল ও কর্মসূচির যেমন অবদান রয়েছে, তেমনি ব্র্যাকের মতো সংস্থারও অবদান রয়েছে তা বিশ্বব্যাংকের সাবেক অর্থনীতিবিদ কৌশিক বসুসহ অনেকেই স্বীকার করেছেন। দারিদ্র্য একটি বহুমুখী ধারণা। তাই দারিদ্র্য মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকার সামগ্রিক পন্থা অবলম্বন করছে। ব্র্যাকের আল্ট্রা-পুওর গ্র্যাজুয়েশন কর্মসূচিও দারিদ্র্য বিমোচনের সামগ্রিক পদ্ধতির ধারণা থেকে উদ্ভূত। সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলোর (ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম) মূল দর্শনের ভিত্তি হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে দ্রুত আয়বৈষম্য কমিয়ে আনা।

সরকার 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূর করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে দারিদ্র্য দূর করে উন্নত দেশ হওয়ার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশকে এখনও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০১৯ সালে আমাদের দারিদ্র্যহার ছিল ২০.৫ শতাংশ এবং চরম দারিদ্র্যহার ছিল ১০.৫ শতাংশ। বিশ্বব্যাংকের প্রতিদিন জনপ্রতি ১.৯ আন্তর্জাতিক ডলার (পিপিপি) হিসেবে ২০২১ সালে দারিদ্র্যের হার হচ্ছে ১১.৯ শতাংশ। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে আমাদের সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন এবং রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমাদের সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করে যেতে হবে। এক্ষেত্রে ব্র্যাকের মতো অন্যান্য এনজিও এবং বেসরকারি খাতকে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে আরও জোরদার ভূমিকা পালন করতে হবে। ■

ড. শামসুল আলম
প্রতিমন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তথ্যসূত্র

- Bangladesh Development Update. (2022). Washington: The World Bank.
- Bangladesh Poverty Assesment. (2019). Washington: World Bank Publications.
- Basu, K. (25 March, 2021). Bangladesh at 50. Retrieved from Project Syndicate: *https://www.project-syndicate.org/commentary/bangladesh-independence-three-reasons-for-economic-success-by-kaushik-basu-2021-03*
- Bourguignon, F., & Morrisson, C. (Sep., 2002). Inequality among World Citizens: 1820-1992. The American Economic Review, 727-744.
- Haque, M. O. (2007). Preliminary Evaluation of Economic Development and its Effect on Income Distribution in Bangladesh. International Journal of Economic Development, 32-58.
- Retrieved from Social Security Policy (SSPS) Programme: (26 September, 2022). *https://socialprotection.gov.bd/en/*

সাক্ষাৎকার

‘কোভিড অতিমারি, জলবায়ু পরিবর্তন এবং নগরায়নের পরিপ্রেক্ষিতে যে চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে, তার সঙ্গে নীতি প্রণয়নের পরিবেশকে সম্পৃক্ত করা অত্যন্ত জরুরি’

বণিক বার্তার বিশেষ ক্রোড়পত্রের জন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, অর্থনীতিবিদ এবং ব্র্যাকের চেয়ারপারসন ড. হোসেন জিল্লুর রহমানের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন ব্র্যাকের আলট্রা-পুওর গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রামের পরিচালক পলাশ দাশ

ড. হোসেন জিল্লুর রহমান

পলাশ দাশ : ব্র্যাকের জন্য দারিদ্র্য নিরসন মানে কী?

জিল্লুর রহমান : দারিদ্র্য নিরসনকে বুঝতে হলে এই প্রক্রিয়াটিকে তিনটি পর্যায়ে দেখতে হবে-মাইক্রো, মেসো এবং ম্যাক্রো লেভেল। প্রথমে বুঝতে হবে দারিদ্র্য নিরসনের ফলে মানুষের জীবনে কী কী পরিবর্তন এসেছে এবং মাইক্রো, মেসো এবং ম্যাক্রো লেভেলের মধ্যে কোন্ ধরনের পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান। প্রতিটি পর্যায়েই আবার চিন্তা করতে হবে দারিদ্র্য নিরসনে ঝুঁকি কমানো, সামাজিক উন্নয়ন ইত্যাদিসহ বিভিন্ন আঙ্গিকগুলো কী কী? এগুলোর মধ্যে কোনটা সবচাইতে বেশি মাত্রায় টেকসই। ব্র্যাকের জন্য সবচেয়ে জরুরি হলো, আমরা যাদের জন্য কাজ করছি তাদের চাহিদা এবং পছন্দগুলো আমরা কতটা পূরণ করতে পারছি তা বোঝা। এক্ষেত্রে ব্র্যাকের নিজস্ব দার্শনিক মত আছে। যার মাধ্যমে আমরা বোঝার চেষ্টা করি যে, যাদের জন্য আমরা কাজ করি সেই পিছিয়েপড়া মানুষের জন্য আমরা সত্যিকার অর্থে সমান সুযোগ তৈরি করতে পারছি কিনা? এক্ষেত্রে প্রথমেই দেখা উচিত, আমরা তাদেরকে মাইক্রো, মেসো এবং ম্যাক্রো-এই তিনটি পর্যায়ে কতটুকু অন্তর্ভুক্ত করতে পারছি।

দ্বিতীয়ত, ব্র্যাকের এই দার্শনিক মত আমাদের দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচির প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই সম্পৃক্ততা যত গভীর হবে, ততই আমরা দারিদ্র্য নিরসনের জন্য কোন্ কোন্ জায়গায় এই পরিবর্তনগুলো প্রয়োজন, তা ভালোভাবে বুঝতে পারব। তাহলে দারিদ্র্য নিরসন বলতে আমরা বুঝি, মাইক্রো লেভেলে খানাভিত্তিক কী কী পরিবর্তন এবং মেসো লেভেলে কমিউনিটিভিত্তিক কী কী পরিবর্তন প্রয়োজন; আর ম্যাক্রো লেভেলে কোন্ ধরণের নীতিমালা দরকার, যার মাধ্যমে আমরা এই দারিদ্র্য নিরসনের সকল নিয়ামককে ব্র্যাকের বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় আনতে পারি।

পলাশ দাশ : স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়ন দেখেছি, দারিদ্র্য নিরসন দেখেছি কিন্তু এগুলো সবই কোনো না কোনো ট্রিগারের মাধ্যমে প্রভাবিত। আপনার মতে এই ট্রিগারগুলো কী ছিল?

জিল্লুর রহমান : স্বাধীনতা যুদ্ধই ছিল বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কাজ করা প্রথম ট্রিগার। স্বাধীনতার পরপরই দেশ পুনর্গঠনের কাজ চলমান রয়েছে এরকম সময়ে আমরা একটি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখলাম। দুর্ভিক্ষের কারণে তখন একইসঙ্গে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দুটোই আরও প্রকট রূপ ধারণ করল। সেই সময়ে আমরা উপলব্ধি করেছি, যেহেতু বাংলাদেশে বেশিরভাগ এলাকাই তখন গ্রামাঞ্চল ছিল, সেজন্য গ্রামগুলোকে উন্নত করতে না পারলে দেশের আসল উন্নয়ন ঘটবে না।

দারিদ্র্য বিমোচনের মূল লক্ষ্য ছিল গ্রামীণ উন্নয়ন। এই লক্ষ্যে সে সময় সরকারের একটি মডেল কাজ করেছে, যা কুমিল্লা মডেল নামে পরিচিত। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি। যে এজেন্সিগুলো সরকারকে সহায়তা করতে এগিয়ে এসেছিল, তাদেরও মূল লক্ষ্য ছিল কীভাবে গ্রামীণ উন্নয়ন এবং মানুষকে ক্ষুধামুক্ত করা যায়।

দ্বিতীয় ট্রিগার কাজ করেছে ৮০'র দশকে। এই দশকে এসে দেখা গেল অনেক সংস্থা মানুষের জীবনমান উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো যেমন : ক্ষুদ্রঋণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি নিয়ে কাজ শুরু করেছে। সে সময় সরকার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা আনার জন্যও কিছু প্রায়োগিক পদক্ষেপ নেয়। এক্ষেত্রে তাদের মূল চেষ্টা ছিল, কীভাবে কৃষিতে পরিবর্তন আনা যায় এবং কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে গতিশীল করা যায়।

তৃতীয় ট্রিগার শুরু হয়েছিল ৮০'র দশকের শেষদিকে। সে সময় হঠাৎ করে ভয়াবহ বন্যা হয়। তখন প্রথমবারের মতো বুঝতে পারি যে, আমরা হয়তো খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হচ্ছি বা প্রয়োজনে আমদানি করছি কিন্তু খাদ্যসহ যে কোনো সহায়তা বন্যায় বিপর্যস্ত মানুষদের কাছে পৌঁছাতে হলে রাস্তাঘাট এবং অবকাঠামো প্রয়োজন। এই উপলব্ধি থেকে সে সময় সারাদেশ জুড়ে বিশাল আকারে অবকাঠামো তৈরির কাজ শুরু হয়, যা যাতায়াত ব্যবস্থাকে সহজতর করার মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ধীরে ধীরে সচল হতে সহায়তা করেছিল। তাই অবকাঠামোর উন্নয়ন সে সময় ট্রিগার হিসেবে সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে।

৯০-এর শেষের দিকে আমরা লক্ষ্য করলাম যাদের জন্য কাজ করছি, যারা আসল হতদরিদ্র, তাদের কাছে আমরা পৌঁছাতে পারছি না। আমরা তখন বুঝতে শিখলাম দারিদ্র্য এক ধরনের বাস্তবতা আর অতিদারিদ্র্য আরেক ধরনের বাস্তবতা। সেই শিখন থেকে আমাদের তখন আলট্রা-পুওর গ্র্যাজুয়েশন-এর কথা মাথায় আসে। ২০০২ সালে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্য নিয়ে ব্র্যাকের আলট্রা-পুওর গ্র্যাজুয়েশন' প্রোগ্রামের যাত্রা শুরু হয়। এই প্রোগ্রামের শুরু দিকের মূল কাজটুকুই ছিল হতদরিদ্র মানুষদের চিহ্নিত করে তাদের প্রয়োজন অনুসারে সহায়তা প্রদান করা।

আমরা আমাদের চতুর্থ ট্রিগার পেলাম ২০০০ সাল পরবর্তী সময়ে। এই সময়ের মধ্যে আমরা দেখলাম শহর অঞ্চলেও দারিদ্র্যের হার আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু করেছে। সেইসঙ্গে পুরো দেশ জুড়েই দারিদ্র্যতার নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি হতে শুরু করল। এই পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে আমরা বুঝতে পারছি যে, শহরাঞ্চলের এই দারিদ্র্য এবং দারিদ্র্য ক্ষেত্রকে আলট্রা-পুওর কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসার জন্য আমাদের আরও নিবদ্ধ অ্যাপ্রোচ গ্রহণ করতে হবে। আমার মতে এই চারটিই গুরুত্বপূর্ণ ট্রিগার, যা আমাদের অতি দারিদ্র্যকে বুঝতে এবং তা নিরসনে সহায়তা করছে।

পলাশ দাশ : ২০২৭-এর পর বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে যোগদান করবে। একইসঙ্গে ২০৩০ সালের মধ্যে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশকেও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে। এমতাবস্থায় অতিদারিদ্র্য নিরসনে আমাদের কী উদ্যোগ নেওয়া উচিত?

জিল্লুর রহমান : আমাদের দেশের জন্য এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উত্তরণকে সামনে রেখে আমাদের কৌশলগত পুনঃচিন্তার কাজটি হাতে নিতে হবে। আগে রাষ্ট্র কীভাবে দারিদ্র্য নিরসন করা যায়- এটি নিয়ে বেশি উৎসাহি ছিল। আমরা দেখেছি তখন বিভিন্ন নীতি এবং কলাকৌশল প্রণয়ন করা হতো, যেগুলোর মূল লক্ষ্য ছিল দারিদ্র্যের হার কমানো। এই দশকে এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে আমাদের নীতিনির্ধারকের নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই মনোভাব এবং একইসঙ্গে নীতি প্রণয়নের পরিবেশে অনেকখানি পরিবর্তনে এসেছে। শুধু তাই নয়, এর সঙ্গে একটি নিয়ন্ত্রণের স্থানও তৈরি হয়েছে। ফলে আগে দারিদ্র্য নিরসনের জন্য যে সমস্ত নীতিমালা বা কলাকৌশল প্রণয়ন করা হতো, সেই চিন্তার ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসায় তা আমাদের সামগ্রিক দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিতে প্রভাব ফেলছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আগে সংস্থাগুলো নিজেদের মতো করে যে কোনো কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারত। তখন আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার চাপ কম ছিল। এখন কোনো কর্মসূচি নিয়ে সামনের দিকে এগোতে গেলে তাদের একটি ফরমাল ইন্সটিটিউশনাল লেন্সের মধ্য দিয়ে যেতে হয়।

এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের সঙ্গেসঙ্গে আমরা আরেকটি জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদের অংশগ্রহণকারী বা যাদের জন্য আমরা কাজ করি, তাদের ধরণ বদলেছে। আমরা ৯০-এর দশক থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত দারিদ্র্যতার নানা রূপ দেখেছি। কিন্তু ৯০-এর দশকে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিতে যে অংশগ্রহণকারীরা ছিল, তারা ২০২০-এর অংশগ্রহণকারীদের থেকে পুরোপুরি ভিন্ন। এই ভিন্নতা বোঝা খুবই জরুরি। তার সঙ্গে আরও দেখতে পাচ্ছি গত দুই বছরে কোভিড-এর যে ধাক্কা এসেছে, তার সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তন, বন্যা, অতিবন্যা, খরা, সাইক্লোন ইত্যাদি নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ আমাদের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিগুলোর ওপর প্রভাব ফেলছে। এ কারণে যে সমস্ত সূচক দিয়ে আমরা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-১ বা দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার চেষ্টা করছি, সেগুলো অর্জন করা আরও কষ্টসাধ্য হয়ে উঠছে। এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে পুষ্টিদারিদ্র্য।

আমাদের কর্মসূচিগুলো আগে সম্পূর্ণভাবে ক্ষুধা নিবারণের জন্য তৈরি করা হতো। কিন্তু এখন এগুলো ক্ষুধা নিবারণের সঙ্গেসঙ্গে পুষ্টি দারিদ্র্যের দিকেও নজর দেয়। দারিদ্র্য নিরসনের ক্ষেত্রে আমরা যদি দারিদ্র্য থেকে মানুষের গ্র্যাজুয়েশন করার কথা বলি, তাহলে বলব পরিবেশে বড় ধরনের পরিবর্তন হয়েছে। এখানে আমরা বড় ধরনের ট্রানজিশন দেখতে পাচ্ছি। গ্র্যাজুয়েশনের ক্ষেত্রে এই ট্রানজিশনের পুরোপুরি সম্পৃক্ততা দরকার। পরিশেষে বলব, আরও কিছু নতুন ইস্যুও তৈরি হয়েছে, যেগুলোর প্রতি নজর দিয়ে তার সমাধান করতে হবে। যেমন : খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন, বাল্যবিয়ে। আরও আছে, শিশু শিক্ষায় ঝরেপড়ার হার বৃদ্ধি, যা আবার বাল্যবিবাহের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বেকারত্বও আরেকটি বড় ইস্যু যেটিতে আমাদের মনোযোগ দেওয়া দরকার।

অন্যদিকে গত এক দশকের ওপর আমরা দেখতে পাচ্ছি নগর দারিদ্র্য অনেকটাই প্রকট হয়েছে। এটি সময়ের সঙ্গে বাড়ছে। তার অর্থ এই নয় যে নগরে অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বের জায়গাটি কমে গেছে। সেটি ঠিকই আছে, তবে শহুরে অর্থনীতিতে দরিদ্রের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার মূল কারণ হলো আয়ের মাধ্যমে তাদের যে প্রাপ্যটুকু হয়, তারা যে সুবিধাটুকু পায়, সেটিকে তারা সামাজিক সুবিধার দিকে নিয়ে যেতে পারছে না। নগরে আয় করতে সমস্যা হচ্ছে না, কিন্তু আয়কে যদি আমরা সামাজিক সুবিধায় ট্রানজিট করতে না পারি, তাহলে নগর দারিদ্র্য আরও বহুমাত্রায় বেড়ে যাবে। নগর দারিদ্র্য তাই সামগ্রিকভাবে দারিদ্র্য নিরসনের ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, কোভিড অতিমারি, জলবায়ু পরিবর্তন এবং নগরায়নের প্রেক্ষিতে যে চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে, তার সঙ্গে নীতি প্রণয়নের পরিবেশকে সম্পৃক্ত করা অত্যন্ত জরুরি। এটি ছাড়া দারিদ্র্য নিরসন সম্ভব নয়। অর্থাৎ আমাদের নতুন কৌশল গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের কথা বিশেষভাবে বলা যায়। আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে দারিদ্র্যের সরাসরি সম্পৃক্ততা পেয়েছি। ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের মূল জায়গাটিকে বোঝা এবং সে সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক জ্ঞান থাকা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু সেখানে এখনও বড় ধরনের ফাঁক দেখতে পাচ্ছি। এই জ্ঞানের সীমাবদ্ধতাটুকু যতক্ষণ না আমরা পূরণ করতে পারছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা জলবায়ু পরিবর্তনকে অ্যাড্রেস করে কীভাবে দারিদ্র্য বিমোচন করব, তা আমাদের জন্য অনেক বড় একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে থাকবে। কারণ আমরা একেক জায়গায় একেক রকম জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব দেখতে পাচ্ছি। কোথাও দেখা যাচ্ছে পানির স্বল্পতা, কোথাও বন্যা, কোথাও আবার ঘূর্ণিঝড়। আমরা যদি জলবায়ুসহিষ্ণু অবকাঠামো এবং সক্ষমতা তৈরি করতে না পারি, তাহলে আমরা পুরোপরিভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের হাত থেকে এই দরিদ্র মানুষদের মুক্ত করতে পারব না।

পলাশ দাশ : আপনার বক্তব্যে বারবার যে পরিবর্তিত পরিস্থিতি বা নতুন চ্যালেঞ্জের কথা উঠে এসেছে, সেগুলোর প্রেক্ষিতে ব্র্যাকের আলট্রা-পুওর গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রামের জন্য আপনার পরামর্শ কী?

জিল্লুর রহমান : আমরা যখন কাজ শুরু করি তখন আমাদের দারিদ্র্য থেকে গ্র্যাজুয়েশন করা নিয়ে যে ধারণা ছিল, সেটি মূলত একটি সরল ধারণা। এখান থেকে এখন আমাদের বের হয়ে আসতে হবে। তখন ব্যাপারটা ছিল অনেকটা এ রকম, একজন অতিদরিদ্র হলে আলট্রা-পুওর গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রামের সদস্য। তাকে সেখান থেকে বের করে আরেকটি ধাপে আনার পর তিনি হন ক্ষুদ্রঋণের সদস্য। দারিদ্র্য থেকে গ্র্যাজুয়েট হলে তিনি ব্র্যাক ব্র্যাংকের গ্রহীতা। আমাদের গ্র্যাজুয়েশনের এই সরল ধারণা থেকে সরে আসতে হবে। আমাদের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ হলো গ্র্যাজুয়েশনকে নতুন পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার সক্ষমতা হিসেবে চিন্তা করা। আগে ধরে নেওয়া হতো গ্র্যাজুয়েশন অ্যাপ্রোচের মধ্যে অংশগ্রহণকারীদের নানা দুর্যোগ সহিষ্ণু করে তোলার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে যেসব নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ দেখা দিচ্ছে সেগুলোকে মোকাবিলা করতে হলে আমাদের গ্র্যাজুয়েশন থেকে সহিষ্ণু গ্র্যাজুয়েশনের দিকে যেতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনসহ অন্য বড় দুর্যোগের কথা বিবেচনায় আনতে হবে এবং অংশগ্রহণকারীদেরকে বড় ঝুঁকি মোকাবিলা করার জন্য আরও সহিষ্ণু করতে হবে। অন্যদিকে গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রাম অংশগ্রহণকারীদের আকাঙ্ক্ষার ধরণ বদলে গেছে। তাদের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে গ্র্যাজুয়েশনের সমন্বয় করতে হবে। এটিও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। অর্থাৎ গ্র্যাজুয়েশনের ধারণাকে অংশগ্রহণকারীদের চাহিদার সঙ্গে মিল রেখে আমাদের নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন এবং তার বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে ব্র্যাকের জন্য তার গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রামকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করতে এই দুটোই হলো আমার বিস্তৃত কৌশলগত পরামর্শ। ■

প্রবন্ধ

বাংলাদেশে চরম দারিদ্র্য নিরসন

ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ

বাংলাদেশের মতো একটি স্বল্পআয়ের দেশে চরম দারিদ্র্যের পূর্ণ নিরসন একটি অবিশ্বাস্য ব্যাপার। এটিই যে কোনো অ্যাকাডেমিক অর্থনীতিবিদের প্রথম প্রতিক্রিয়া হবে। এ ধরনের লক্ষ্যমাত্রা সাধারণভাবে প্রচলিত উন্নয়নের ধারণা এবং বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতাকে চ্যালেঞ্জ করে। তবে আমরা দেখেছি, বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই বেশকিছু দুরূহ লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হয়েছে, যা অর্জন করার জন্য বরাবরই খুব কঠিন ছিল। যেমন : শিশুমৃত্যু হ্রাস, কন্যাশিশুদের বিদ্যালয়মুখী করা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস বা দরিদ্র মানুষের কাছে ক্ষুদ্রঋণ পৌঁছে দেওয়া। সুতরাং যদি কোনো স্বল্পআয়ের দেশ সাধারণ অর্থনৈতিক নীতিকে চ্যালেঞ্জ করে থাকে, সে দেশটি বাংলাদেশ।

আয়বণ্টনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন লক্ষ্যমাত্রা কেন বিবেচনায় আনা হয়? সাধারণত অর্থনীতিবিদরা তথাকথিত 'আয়বণ্টন' রেখার মাধ্যমে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে যে কোনো দেশের কত শতাংশ মানুষ আয়ের কোন্ স্তরে অবস্থান করছে, তা নির্ধারণ করেন। এই রেখাটির সর্বোচ্চ বিন্দুটি গড় আয় নির্দেশ করে এবং দু'পাশে ক্রমশ নিচের দিকে লেজের মতো নেমে যায়। উচ্চআয় বা রেখার ডানদিকের অংশ বা লেজ, যে কোনো দেশের ধনীদের সংখ্যা, একইসঙ্গে তাদের সম্পদের/আয়ের ক্রমবর্ধমান অবস্থা এবং বামদিকের অংশ বা লেজ দরিদ্র জনসংখ্যা নির্দেশ করে, একইসঙ্গে সীমিত থেকে শূন্যআয়ের দিকে ক্রমহ্রাসমানতা নির্দেশ করে।

আয়ের যতই সমবন্টন হোক না কেন, এই ভাগ বা দু'পাশে লেজ থাকবেই। যদি আর কোনো কারণ না-ও থাকে তাহলে শুধুমাত্র ভাগ্যের কারণে কিছু মানুষ চরম দরিদ্র। আমাদের দেশের মতো মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে চরম দারিদ্র্য নিরসন মানে আয়বন্টন রেখার স্বল্পআয়ের দিকে বিদ্যমান লেজের শেষাংশ কেটে ছোট করে ফেলা অথবা রেখাটির বাম অংশ প্রচলিত অবতল আকার থেকে উত্তল আকার ধারণ করা, যাতে ন্যূনতম প্রান্তিক আয়ের নিচে কেউ অবস্থান না করে। আয়বন্টন রেখার লেজ সোজা করা কুকুরের লেজ সোজা করার মতোই অসম্ভব।

এ সকল বিপত্তি সত্ত্বেও ইতিবাচক দিকগুলো বিবেচনা করতে হবে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ স্যার পার্থ দাশগুপ্ত তার বহুল আলোচিত বই 'অ্যান ইনকোয়ারি ইনটু ওয়েলবিয়িং অ্যান্ড ডেস্টিটিউশন'(An inquiry into well-being and destitution)-এ বলেছেন, কোনো দেশই এত দরিদ্র নয় যে, সে তার সকল অধিবাসীর মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত করতে পারবে না। কিন্তু সেটি করার জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রয়োজন। এই রাজনৈতিক সদিচ্ছার সঙ্গে সুশাসন সম্পৃক্ত। সুশাসনের অন্যতম উপাদান হচ্ছে সম্পদ আহরণ বা সমাবেশ করা, যা নাগরিকদের সামাজিক ব্যয় এবং চিহ্নিত নাগরিকদের সুনির্দিষ্ট সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য জরুরি। সংখ্যাতাত্ত্বিক বিবেচনায় আমাদের জাতীয় আয়ের মাত্র তিন শতাংশ ব্যয় করলে আমাদের বর্তমান আয়বণ্টন অনুযায়ী তথাকথিত দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা সকল মানুষের চরম দারিদ্র্য নিরসন করা সম্ভব এবং সেটি এ বছরেই সম্ভব। কিন্তু তার জন্য ধনীদের ওপরে অতিরিক্ত কর আরোপ করে আরও বেশি সম্পদ সৃষ্টি করতে হবে, যা দিয়ে চরম দরিদ্র মানুষের জন্য কাজ করতে হবে।

আমাদের জাতীয় উৎপাদনের মাত্র ১১ শতাংশ কর থেকে আসে, যেখানে নেপালে এই হার ১৫ শতাংশ এবং অন্যান্য সম্ভাবনাময় উন্নয়নশীল দেশের কথা বলাই বাহুল্য। আমাদের রাজস্ব আয়ের ক্ষেত্রে কর ফাঁকি সবচেয়ে দুর্বল দিক। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা ব্যয় জরিপ ২০১০ অনুযায়ী,

ছবি: প্রণব ঘোষ, ব্র্যাক

গবেষণায় দেখা গেছে চরম দারিদ্র্যে বসবাসরত মানুষকে নগদ অর্থ সহায়তার পরিবর্তে উৎপাদনমূলক সম্পদ বা উপকরণ দিলে সেটি তাদের জীবনধারণের টেকসই উপায় হয়ে উঠতে পারে

ছবি: প্রণব ঘোষ, ব্র্যাক

গবেষণায় দেখা গেছে আকাঙ্ক্ষা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বড় উপাদান। এদেশের মানুষ দরিদ্র হলেও উন্নয়ন সচেতন এবং উন্নত জীবনের অভিলাষী। আশপাশের মানুষকে উন্নত আয় করতে দেখার ফলে প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষও দারিদ্র্যকে আর নিয়তিনির্ধারিত মনে করে না

সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির সুবিধা পাওয়া মানুষের অর্ধেকই দরিদ্র পরিবারের সদস্য নয়।

সৌভাগ্যবশত আমাদের কিছু সুবিধা রয়েছে। কিছু ছোট ছোট সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে বাদ দিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মানুষের ঊর্ধ্বমুখী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কোনো শ্রেণি বা বর্ণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। এ দেশের মানুষ দরিদ্র হলেও উন্নয়ন সচেতন এবং উন্নত জীবনের অভিলাষী। গবেষণায় পাওয়া গেছে আকাঙ্ক্ষা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বড় উপাদান। যেহেতু তার আশেপাশের মানুষদেরকে কোনো না কোনো উপায়ে উচ্চতর আয় করতে দেখছে, এখন প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষও দারিদ্র্যকে তার নিয়তি নির্ধারিত মনে করে না। এজন্যই দরিদ্র মানুষও তার কন্যাশিশুকে স্কুলে পাঠায়, যা আমাদের উন্নয়নের এক অনন্য অর্জন।

বাংলাদেশে নানা ধরনের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি রয়েছে যা নানা সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনকে সামনে রেখে পরিচালিত হয়। চরম দরিদ্র পরিবারের কর্মক্ষম সদস্যদের জন্য বছরে ন্যূনতম কিছুদিনের কাজের নিশ্চয়তা প্রয়োজন, বিশেষ করে গ্রামের কৃষিকাজ না থাকা মৌসুমে। যেসব পরিবারে কর্মক্ষম সদস্য নেই, তাদের নগদ অর্থ সহায়তা করা প্রয়োজন। লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্সের অধ্যাপক রবিন বার্জেসের নেতৃত্বে সাম্প্রতিক এক গবেষণায় উঠে এসেছে চরম দরিদ্র মানুষকে নগদ অর্থ সহায়তা করার পরিবর্তে উৎপাদনমূলক কোনো সম্পদ বা উপকরণ সরবরাহ করলে সেটি তার জীবনধারণের টেকসই উপায় হয়ে উঠতে পারে। একটি সার্বিক সামাজিক সুরক্ষা কৌশলের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ নানা জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনকে মাথায় রেখে সমন্বয় করতে হবে। একইসঙ্গে নীতিনির্ধারকদের মনে রাখতে হবে তা যেন প্রয়োজনের তুলনায় কর্মসূচির সংখ্যায় ভারাক্রান্ত না হয়ে ওঠে, যা মনিটর করা খুব কঠিন। অথবা অতি কমসংখ্যক মানুষের জন্য যেন না হয়, যাতে বন্টনের খরচ অন্যায্য হয়ে ওঠে।

লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে চরম দারিদ্র্য নিরসনের সাধারণ এবং সহজে পরিমাপযোগ্য সূচক রাখার সুবিধা রয়েছে। কিন্তু এই একক পরিমাপকের পেছনে যে নানা ধরনের বঞ্চনা ও ঝুঁকি লুকিয়ে আছে, সে বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। যেমন: দক্ষিণ আফ্রিকায় দ্রুত দারিদ্র্য নিরসনের পরও শিশুদের অপুষ্টির হার অপরিবর্তিত রয়ে গেছে, যা সামজিক উন্নয়ন সূচকের এক ধাঁধা হয়ে আছে। একইভাবে বছরের গড় দারিদ্র্য বা খাবার গ্রহণের আড়ালে মৌসুমী দারিদ্র্য বা ক্ষুধা লুকিয়ে থাকে। 'মঙ্গা' নামে পরিচিত বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের মৌসুমী ক্ষুধার সমস্যা মোকাবিলায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য এলেও, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশের অবনতির ফলে দেশের অন্যান্য অংশে দারিদ্র্য ও ক্ষুধার নতুন নতুন পকেট তৈরি হয়েছে।

রংপুর অঞ্চলে মঙ্গা মোকাবিলার পদক্ষেপগুলো গণমাধ্যমের প্রতিবেদন এবং নাগরিক উদ্যোগের ফলে সৃষ্ট জনসচেতনতা দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। অমর্ত্য সেন মনে করেন ক্ষুধা ও চরম দারিদ্র্য মোকাবিলার তুলনায় দুর্ভিক্ষের মতো বড় অর্থনৈতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় গণতন্ত্র কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। মঙ্গার বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক নাগরিক কার্যক্রম প্রমাণ করে গণতন্ত্রে রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে এবং জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারলে মৌসুমী ক্ষুধার মতো মারাত্মক সমস্যা মোকবিলা করা সম্ভব। তবে মৌসুমী ক্ষুধা ও দারিদ্র্য সমস্যার ঝুঁকিতে থাকা দেশের অন্য অঞ্চল একই ধরনের সচেতনতার অভাবে হয়তো অবহেলিতই রয়ে গেছে। ■

(২০১৫ সালের ২৯ জুন এলএসই ব্লগে লেখাটি ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়)

ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ
বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং
জাতিসংঘের উন্নয়ন নীতিমালা সংক্রান্ত কমিটির সদস্য

প্রবন্ধ

অতিদরিদ্র নারীর ক্ষমতায়নে প্রয়োজন লাগসই ও টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি

নাজনীন আহমেদ

দারিদ্র্য মানেই বঞ্চনা-একথা সত্য, তবে এই বঞ্চনার কষাঘাত নারী-পুরুষ ভেদে ভিন্নমাত্রায় হয়ে থাকে। নানা তত্ত্ব আর উদাহরণের মাধ্যমে এই বাস্তবতা প্রতিষ্ঠিত যে, নারীর ওপর দারিদ্র্যের নানামুখী প্রভাব পুরুষের তুলনায় গভীর হয়, আর জেন্ডার অসমতার কারণে এরূপ দারিদ্র্য থেকে উত্তরণের পথও নারীর জন্য অনেক কঠিন। বাংলাদেশের জনসংখ্যার অন্তত ১০.৫ শতাংশ বৈশ্বিক দারিদ্র্যসীমা দৈনিক ১.৯০ মার্কিন ডলারের নিচে বাস করে। দরিদ্র এ মানুষেরা পরস্পর যুক্ত নানামুখী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। উৎপাদনশীল সম্পদের অভাব যেমন তাদের প্রকট, তেমনি সামাজিক নানা সুবিধা গ্রহণের ক্ষমতাও তাদের কম থাকে। এই অতিদরিদ্র মানুষের মধ্যে নারীকে আবার সম্মুখীন হতে হয় জেন্ডার বৈষম্যের। সামাজিক কাঠামোগতভাবেই অতিদরিদ্র নারীর অবস্থা দরিদ্রদের মধ্যেও দরিদ্রতর। তাই অতিদরিদ্র পরিবারে নারীর ক্ষমতায়নে প্রয়োজন খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষার সুযোগ, উৎপাদনশীল সম্পদ ও সেবা গ্রহণের সুযোগ এবং সেইসঙ্গে জেন্ডার বৈষম্যহীন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি। আয়-দারিদ্র্য দূর করার প্রচলিত আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে অতিদরিদ্র নারীর ক্ষমতায়ন কিংবা দারিদ্র্য থেকে তার উত্তরণ সম্ভব নয়।

এ কথা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, নারীর ক্ষমতায়নের এক বড় নিয়ামক তার অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন। এই অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ধারণার সঙ্গে শিক্ষার সুযোগ, অর্থ-সম্পদ অর্জন, মালিকানা, খরচের অধিকার, এই সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীন ক্ষমতা-ইত্যকার বিষয়গুলো ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর অতিদরিদ্র খানার নারীর অর্থনৈতিক সক্ষমতা টেকসই ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো জরুরি। বিষয়টি খুব সহজ নয়, কারণ এরূপ নারীর দারিদ্র্যের সমীকরণ অনেক জটিল। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় প্রদত্ত নানা সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করার মতো পর্যাপ্ত তথ্য ও সক্ষমতা অনেক নারীর থাকে না। ফলে এই নারীদের জন্য প্রয়োজন একটি ব্যাপকভিত্তিক, সমন্বিত ও নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে সামনে অগ্রসরমান কর্মসূচি। দারিদ্র্য বিমোচনে পথিকৃৎ প্রতিষ্ঠান ব্র্যাকের আলট্রা-পুওর গ্র্যাজুয়েশন কর্মসূচি (ইউপিজি) এমনই একটি উদ্যোগ। এতে দারিদ্র্য থেকে উত্তরণের যে সমন্বিত ও ব্যাপক কার্যক্রমের সন্নিবেশ ঘটেছে, তাতে অতিদরিদ্র পরিবারে নারীর দারিদ্র্য বিমোচনের জটিল সমীকরণকে সহজ করার নানা বিষয়কে বিশেষভাবে আমলে নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচির নানা প্রশিক্ষণ, সম্পদ ও সঞ্চয় প্রবণতা গড়ে তোলা, স্বাস্থ্যসেবা এবং নানা সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচিতে নারীর অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচিতে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ থাকলেও দক্ষতার অভাবে কিংবা অনেক সময় ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করার পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকায় নারীরা পিছিয়ে পড়ে। অনেক নারী জানেন না কী করে আয়ের হিসাব-নিকাশ রাখতে হবে, যাতে এই আয়ের ওপর তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্যোগের সঙ্গে যদি এ ধরনের জীবনমুখী দক্ষতা যুক্ত করা যায়, তাহলে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব। অনেক সময় উৎপাদিত পণ্যের বাজার ব্যবস্থাপনার সঙ্গে নারীর সংযোগ কম দেখা যায়। ফলে অনেক নারী নিজের উৎপাদিত কৃষি কিংবা শিল্পপণ্য নিজে বাজারজাত করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। ইউপিজি কর্মসূচির বিশেষত্ব হলো সার্বিকভাবে ক্ষমতায়নের বিষয়টিকে আমলে নিয়ে এতে আয়বর্ধনের পাশাপাশি সম্পদ অর্জন এবং বাজার ব্যবস্থার সঙ্গে ঘটিয়ে ও

ছবি: প্রণব ঘোষ, ব্র্যাক

নারীর ক্ষমতায়নের বড় নিয়ামক তার অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন। অতিদরিদ্র পরিবারের নারীর অর্থনৈতিক সক্ষমতা টেকসই ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো জরুরি

ছবি: প্রণব ঘোষ, ব্র্যাক

অতিদরিদ্র পরিবারে নারীর দারিদ্র্যের সমীকরণ অনেক জটিল। জেন্ডার অসমতার কারণে অতিদারিদ্র্য থেকে উত্তরণের পথও নারীর জন্য দুরূহ। ফলে তাদের জন্য দরকার একটি ব্যাপকভিত্তিক, সমন্বিত ও নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে সামনে অগ্রসরমান কর্মসূচি

সেইসঙ্গে সামাজিক সম্পর্কের মূলধনকে দারিদ্র্য বিমোচনে কাজে লাগানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। নারীর ক্ষমতায়নে এ ধরনের সার্বিক কর্মসূচিই প্রয়োজন। আমার কর্মস্থল জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি-বাংলাদেশ)-তে এরূপ সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন উদ্যোগ দেখা গেছে, নারীকে আয়-ব্যয়, সঞ্চয় ও সম্পদ অর্জন এসব দিকে সহায়তা করা গেলে এবং সেইসঙ্গে জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ থাকলে নারীর অগ্রযাত্রা অনেক শক্তিশালী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এরকম ক্ষমতায়িত নারী জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা মোকাবিলাতেও সক্ষম। যে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতা যত শক্তিশালী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেই নারী তত দৃঢ়তার সঙ্গে সহিংসতার মোকাবিলায় পদক্ষেপ নিতে পারে।

বংশ-পরম্পরায় যে দারিদ্র্য পরিবাহিত হয়, তা দূর করার জন্য নারীর দারিদ্র্য দূর করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পুষ্টি-দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ অপুষ্ট মা। নারীর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণের জন্য স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, চলাফেরা, সন্তান জন্মদানে স্বাস্থ্যসম্মত উপায় অবলম্বন- এসব পদক্ষেপও প্রয়োজন। সেজন্য অতিদরিদ্র নারীর দারিদ্র্য বিমোচনের ধারণার সঙ্গে তার পুষ্টির ধারণাটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যা নিশ্চিত করা গেলে পরবর্তী প্রজন্মের সুস্বাস্থ্যের সম্ভাবনা বাড়ে। আবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়িত নারীর সন্তানের শিক্ষার সম্ভাবনাও অনেক বেশি থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে, অতিদরিদ্র নারীর যদি আয় বাড়ে, তবে তার বড় অংশই যায় তার সন্তানের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার কাজে। সেজন্য নারীর দারিদ্র্য দূর করা সমাজিকভাবে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার কলেবর বৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা রাখে। ইউপিজি কর্মসূচির সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমে বংশ-পরম্পরায় দারিদ্র্য দূরীকরণের যে উদ্যোগ, তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। নানা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিতে এ ধরনের সমন্বিত প্রয়াসই থাকা দরকার।

কোভিড অতিমারির সময় নতুনভাবে উপলব্ধি হয়েছে যে কেবল অতিদরিদ্র পরিবারে নয়, সাধারণ দরিদ্র পরিবার এমনকি দারিদ্র্যসীমার কিছুটা ওপরে বসবাসরত ভঙ্গুর অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবারগুলোর জন্যও সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন এবং অর্থনৈতিক অবস্থার অগ্রগতির নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে পরিচালিত কর্মসূচি প্রয়োজন। এগুলো কেবল লাগসই হলে চলবে না, টেকসইও হতে হবে। কোভিড অতিমারির সময় দেখা গেছে নগর দরিদ্রদের সামাজিক সম্পর্কের মূলধন কম থাকায় তাদের এই ধরনের আকস্মিক দুর্যোগ মোকাবিলায় দরকারি সব ধরনের সামর্থ্য কম থাকে। সেজন্য আগামীতে গ্রামীণ দারিদ্র্যের পাশাপাশি নগর দারিদ্র্য দূরীকরণেও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি থাকতে হবে। বিশেষ করে আকস্মিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষমতা তৈরি করতে হবে। এসব ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণও জরুরি। কারণ কোভিড অতিমারির সময় এটিও উপলব্ধ হয়েছে যে, এ ধরনের দুর্যোগে নারীর ওপর নানারকম বাড়তি অর্থনৈতিক, সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত চাপ তৈরি হয় এবং বাল্যবিবাহের প্রবণতাও বেড়ে যায়। সেজন্য এসব আকস্মিক দুর্যোগে নারীর জন্য বিশেষ কর্মসূচি থাকা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার সঙ্গেসঙ্গে অতিদরিদ্র মানুষের জন্য কর্মসূচির আওতা বাড়াতে হবে। টেকসই উন্নয়নের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধির কর্মসূচিতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ যদি নারী না পায়, তাহলে সমাজের নানা অর্থনৈতিক সুযোগ গ্রহণ থেকে তারা বঞ্চিত হবে। দারিদ্র্য বিমোচনে ব্র্যাকের দীর্ঘদিনের যে অগ্রযাত্রা, বিশেষ করে তাদের ইউপিজি কর্মসূচির আওতায় যেভাবে নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব হয়েছে, তা অন্য দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির জন্য একটি ভালো উদাহরণ।

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের সঙ্গেসঙ্গে সামাজিক ক্ষমতায়নও জরুরি, যার মাধ্যমে নারীর আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়; আর সে আত্মবিশ্বাস নারীকে বহুদূর এগিয়ে দেয়, তার টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করে। দরিদ্র নারী মানেই অসহায় নারী-এই ভ্রান্ত ধারণা ফেলে দিয়ে তার ক্ষমতার প্রদীপকে প্রজ্জ্বলিত করার মানসিকতায় পরিচালিত হোক বাংলাদেশের সকল দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি-সেই আশা রাখি। ■

নাজনীন আহমেদ
কান্ট্রি ইকোনমিস্ট
জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) বাংলাদেশ

জীবনের গল্প

আফরোজা – সাহস আর সংগ্রাম যার পরিচয়

ছবি: প্রণব ঘোষ, ব্র্যাক

জীবনের দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে জয়ী হয়েছেন আফরোজা। গবাদি ও হাঁস-মুরগি পালন এবং সবজিচাষ করে পরিবারের ভরণপোষণ করছেন। জেলা প্রশাসন থেকে "সংগ্রামী নারী" হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছেন। সমাজে তাঁর মর্যাদা আজ অনেক উঁচু

জীবন সংগ্রামে অদম্য এক নারী আফরোজা। জীবনে তার কখনও সংগ্রামের অভাব হয়নি। মাদকাসক্ত ও দুশ্চরিত্র স্বামীর অত্যাচার সইতে না পেরে স্বামীকে পরিত্যাগ করেন। নিঃস্ব হয়ে এতিম সন্তানের হাত ধরে আশ্রয় নেন বিধবা মায়ের সংসারে। সেখানেও নুন আনতে পান্তা ফুরোয় অবস্থা। দুই কাঠা জায়গায় ছোট্ট কুঁড়েঘরে মাথা গোঁজার ঠাঁই হলেও পেটের ক্ষুধা মিটবে কীভাবে? অন্যের বাড়িতে কাজ খুঁজতে শুরু করেন। সেই সুযোগ পাওয়াও সহজ নয়। এলাকার সবারই অভাবের জীবন। নিজেদেরই কাজ নেই। অন্যদের কাজ দেবে কীভাবে?

তবে পানের বরজের কাজ পাওয়া সহজ। কারণ ছেলেরা বরজে কাজ করলেও মেয়েরা করে না। অনেক অনুরোধেও ফল পাওয়া যায় না। পরে মহাজনের কাছে ওয়াদা করে আফরোজার কর্মসংস্থান হয়। এই সুযোগ বৃথা যেতে দেননি আফরোজা। প্রমাণ করেছেন ছেলেদের চাইতে কোনো অংশে কম পারেন না। মহাজন যেমন অবাক হন, তেমনি খুশি। বরজে স্থায়ী কাজের ব্যবস্থা করে দেন।

তবে কাজ মানেই সম্মান নয়। বরজে কাজ নেওয়ায় আফরোজাকে নিয়ে বাজে কথা বলতে থাকে সমাজের নানাজন। কিন্তু আফরোজা অন্যের কথায় দমে যাওয়ার মানুষ নন। সকলের কথা অগ্রাহ্য করে তিনি একাগ্র মনে বরজের কাজ করে সংসার চালাতে থাকেন। তবে এর মধ্যেই মাথাচাড়া দেয় নতুন বিপদ।

একমাত্র ছোটো বোনও স্বামী পরিত্যক্তা হয়ে একমাত্র মেয়েকে বুকে করে আশ্রয় নেয় আফরোজার সংসারে। অভাবের সংসারে আরও দু'জনের ভাত-কাপড় জোগাতে তাকে হিমশিম খেতে হয়। বাধ্য হয়ে তার ১২ বছরের নাবালক ছেলে ট্রাকের হেলপার হিসেবে কাজ নেয়। ধুঁকে ধুঁকে জীবন চলতে থাকে। নিয়তির নির্মম পরিহাস আর দুঃখের বোঝা আরও বেড়ে যায়।

আফরোজার একমাত্র আশার আলো, একমাত্র সন্তান ট্রাক দুর্ঘটনায় দুনিয়ার মায়া ছেড়ে পরপারে চলে যায়। থেমে যায় জীবন। সবকিছু যেন অন্ধকার হয়ে আসে। কিন্তু কাজ না চললে সংসারের বৃদ্ধা মা, বোন ও বোনঝিকে না খেয়ে থাকতে হবে। আবারও বরজের কাজে মনোনিবেশ করেন আফরোজা।

ব্র্যাক আলট্রা-পুওর গ্র্যাজুয়েশন কর্মসূচির পক্ষ থেকে এই পর্যায়ে আফরোজাকে ২২ হাজার টাকা মূল্যের একটি ষাঁড় দেওয়া হয়। গরুটিকে তিনি পরম যত্নে লালনপালন করতে শুরু করেন। ব্র্যাককর্মী ফাতেমা খাতুনের পরামর্শে দিনদিন আফরোজার মনের অবস্থায় পরিবর্তন আসে। বাঁচার আশা খুঁজে পান। তার পরামর্শ অনুযায়ী বাড়িতে সবজির চাষ শুরু করেন, নেটে হাঁস-মুরগি পালন করেন। বিক্রয়োপযাগী হলে ৮ মাসের মাথায় বেশি লাভে গরুটি বিক্রি করে দেন। লভ্যাংশ দিয়ে একটি গর্ভবতী ছাগল কেনেন ও ২০ শতক জমি লিজ নিয়ে ধান চাষ শুরু করেন। বাকি টাকা দিয়ে অরেকটি ষাঁড় কিনে পালতে থাকেন।

আফরোজার গল্প শুনে ব্র্যাক সামাজিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচির মাধ্যমে গত ৮ মার্চ ২০২২ বিশ্ব নারী দিবসে আফরোজাকে বাগেরহাটের জেলা প্রশাসক সংগ্রামী নারী পুরস্কারে ভূষিত করেন।

যেখানে তাকে নিয়ে বাজে কথা হতো, আজ সেই এলাকার সবাই তাকে সম্মান করে। আফরোজা নিজেই বলেন, আগামী এক বছরের মধ্যে তিনি কৃষি ও গরুর খামার করে অন্যের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবেন। এখন তিনি নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখছেন, নতুন করে বাঁচার পথ খুঁজে পেয়েছেন। ■

জীবনের গল্প

জীবনের পথ ধরে শামসুন্নাহারের ছুটে চলা

ছবি: মুনেম ওয়াসিফ, ব্র্যাক

বাল্যবিয়ের শিকার শামসুন্নাহার জীবনে হার মানতে শেখেননি। অভাবে পর্যুদস্ত স্বামীর সংসারের হাল ধরেছেন ও সন্তানকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়েছেন। দারিদ্র্য জয়ের পরও নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টায় ছুটে চলেছেন তিনি

রংপুরে আমার জন্ম, বড় হয়ে ওঠা। শৈশব থেকেই অভাবের সঙ্গে পরিচয় কিন্তু আমাদের ছোট পরিবারে কখনও ভালোবাসার কমতি দেখিনি। একটি খড়ের ঘর, সেখানেই মা-বাবা, ভাইবোন সবাই মিলে থাকতাম। গরমকাল তো যেমন-তেমন, শীতের রাতগুলো যেন কাটতেই চাইত না।

বাবা চাষাবাদ করে যা আয় করত তাতেই আমাদের সংসার চলত। ফলে সংসারে সবসময়ই টানাটানি ছিল। তবে শিশুকাল ছিল স্বাধীন জীবন। লুকোচুরি, ক্রিকেট, ফুটবল যখন যা খেলা হতো সে খেলায় আমার থাকা চাই-ই-চাই। আমি কখনও হারতে চাইতাম না। জেতার জন্য এক ধরনের জিদ কাজ করত। আমার দুরন্তপনা দেখে সবাই নাম দিয়েছিল 'দৌড়ানি রানি'।

আমার সেসব চিত্র বদলে গেল ক্লাস ফাইভে ওঠার পর। সে বছর আমার বিয়ে হয়ে যায়। আগে মাঠে-ময়দানে ছুটে বেড়াতাম, তারপর সংসারের কাজে ছোটাছুটি শুরু হলো। আমার সান্ত্বনা ছিল, একজন ভালো মানুষের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পর অনেকদিন পর্যন্ত সন্তান না হওয়া নিয়ে পাড়া-প্রতিবেশীরা যখন টিপ্পনি কাটত, তখন তিনিই আমাকে আগলে রাখতেন।

বিয়ের দশ বছর পর আমি প্রথম মা হই। পরপর এক মেয়ে, এক ছেলে এল আমাদের সংসারে। অভাব, অনটন যা-ই থাকুক, তারপরও বলব ভালোই ছিলাম।

আমার বড় মেয়ের বয়স যখন চার, তখন আমার স্বামীর ক্যানসার ধরা পড়ে। কিছুদিনের মধ্যেই সুস্থ-সবল মানুষটা চোখের সামনেই শয্যাশায়ী হলেন। এরপর তো মৃত্যুকেই বরণ করে নিলেন। তখন থেকেই এক ভয়াবহ দুঃসময় আমাদেরকে গ্রাস করে নিল।

স্বামী মারা যাওয়ার পর শ্বশুরবাড়ির লোকজন মুখ ফিরিয়ে নিল। তারা চাইত স্বামীর ভিটে-মাটি ছেড়ে আমি যেন সন্তানসহ বাবার বাড়ি চলে যাই। আশেপাশের মানুষ আমার বাবা-মাকে গিয়ে বলত আমাকে আবার বিয়ে দেওয়ার কথা।

এবার আমি কারও ওপর ভরসা না করে নিজেই সংসার চালানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। বাসাবাড়িতে কাজ নিলাম। সকালে কাজে যাওয়ার আগে ঘরদোর পরিষ্কার করে, রান্নাবান্না সেরে ছেলেমেয়েকে স্কুলে দিয়ে আসতাম। দুপুরে কাজ সেরে আবার তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে ফিরতাম। দুপুরে কিছুক্ষণ ঘরের কাজ করতাম তারপর আবার কাজে যেতাম। সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে চলত ছেলেমেয়েদের পড়ানোর পালা। প্রতিদিন আমি শুধু এইটাই ভাবতাম, যত কষ্টই হোক সন্তানদের লেখাপড়া শেখাতেই হবে।

এভাবে দশ বছর বাসাবাড়িতে কাজ করে সংসার চালাই। তারপর একদিন ব্র্যাকের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির সদস্য হওয়ার সুযোগ আসে। প্রথমে গবাদি পশু পালনের প্রশিক্ষণ নিই, তারপর আমাকে কর্মসূচি থেকে দশটি মুরগি আর একটি গরু দেওয়া হয়। প্রতি সপ্তাহে ব্র্যাকের ভাই-আপারা এসে গবাদি পশুর নানা রোগবালাই ছাড়াও পুষ্টিকর খাবার, বাল্যবিবাহ, যৌতুক, নারী নির্যাতনসহ নানা বিষয় সম্পর্কে জানাতেন।

সঞ্চয় করার জন্য আমাদের উৎসাহ দিতেন। পশুপালনের আয় থেকে আমি অল্প অল্প করে টাকা জমাতে শুরু করলাম। এরপর একদিন একটি জমি কিনে গ্রামে নতুন ঘর তুললাম। আমার আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল বহুগুণ! আয় বাড়ল, সংসারে সচ্ছলতা এল। আমার মেয়ে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। ছেলে কলেজে পড়ার পাশাপাশি পার্টটাইম চাকরিও করছে। সে ডাক্তার হতে চায়। বিনা চিকিৎসায় বাবাকে চলে যেতে দেখেছে, সেজন্য আমাদের মতো কষ্টে থাকা মানুষের জন্য কিছু করতে চায়।

আমরা ভালো আছি, চাই অন্যরাও ভালো থাকুক। চেষ্টা করছি যেন সমাজের অন্য অসহায় মানুষের পাশে থাকতে পারি। যেসব পরিবারের ছেলেমেয়েরা অভাবের কারণে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে, আমি সাধ্যমতো তাদের পাশে দাঁড়াই। আমি জানি একটু সহায়তা ও অনুপ্রেরণা বদলে দিতে পারে তাদের জীবন।

শৈশবের হার-না-মানা আমি এখনও লড়াই করে যাচ্ছি। সময় বদলেছে, বদলে গেছে পথ। কিন্তু আমি ছুটছি তো ছুটছিই। প্রতিনিয়ত নিজেকে নিজে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্যই এ ছুটে চলা। ■

প্রবন্ধ

দারিদ্র্য হ্রাসকরণ থেকে বিমোচন – সময়ের প্রয়োজনে সম্ভাব্য বাস্তবতা

পলাশ দাশ

দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কখনই সহজসাধ্য কাজ নয়। বাংলাদেশে স্বাধীনতা পরবর্তী সকল পদক্ষেপ ও নীতি প্রণয়ন থেকে শুরু করে কর্মসূচি বাস্তবায়ন, সমস্ত কিছুকেই জটিল একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। তারই ফলস্বরূপ আমরা বর্তমান সময়ে 'দারিদ্র্যের হার' এবং 'দারিদ্র্যের সংখ্যা' উভয়কেই আশানুরূপ হারে কমাতে পেরেছি। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন থেকে যায় আমরা কি সত্যিই পুরোপুরিভাবে দারিদ্র্য বিমোচন করতে পারব? অথবা এখন পর্যন্ত যে অগ্রগতি হয়েছে তা কি যথার্থই টেকসই? এই প্রশ্নের উত্তর হয়তোবা প্রশ্নের ভেতরেই লুকিয়ে আছে অর্থাৎ আমরা কীভাবে 'বিমোচন'-কে সংজ্ঞায়িত করছি এবং কীভাবে আমরা 'টেকসই'-এর ধারণাকে ধারণ করছি, তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। স্বভাবতই এই প্রক্রিয়ার মধ্যে সবচাইতে জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সময়ের প্রয়োজনে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, যা ওই সময়ের মধ্যে ঝুঁকিগুলোকে চিহ্নিত করে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল এবং কর্মসুচি, উভয়েরই ভবিষ্যৎ রূপরেখা নিরূপণ করতে পারে। অবশ্য এও সত্য যে, একটি দেশ থেকে দারিদ্র্যকে পুরোপুরি বিমোচন করে ফেলা সম্ভব নাও হতে পারে। তবে দারিদ্র্য হ্রাসকরণের হারকে সঙ্গতিপূর্ণভাবে টেকসই করতে পারলে দারিদ্র্য বিমোচনের দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়াকে স্বল্পমেয়াদিতে রূপান্তরিত করা সম্ভবপর। এর মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জন করা সম্ভব।

কোভিড অতিমারির সময়ে আমরা দেখেছি কীভাবে আমাদের দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে অর্জিত অগ্রগতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সে সময় সারাবিশ্ব জুড়েই হুট করে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল, যা ছিল আমাদের কল্পনাতীত। শুধু তাই নয়, একই কারণে বর্তমানে উন্নত, অনুন্নত সকল দেশেই অসমতা এবং দারিদ্র্য আরও গভীর হয়েছে। ফলস্বরূপ ধারণা করা হচ্ছে যে, ২০৩০ সাল নাগাদ ৫৮.৮ কোটি মানুষ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করবে। যা স্পষ্টতই এই সময়ের মধ্যে 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা'-এর লক্ষ্য-১ অর্জন করাকে আরও দুরূহ করে তুলেছে। আমরা যদি গত কয়েক দশকের ঝুঁকির মাত্রা এবং প্রবণতা অনুসরণ করি, তাহলেও সহজেই উপলব্ধি করতে পারব যে, প্রতিটি বড় ধরনের ঝুঁকির সঙ্গে দারিদ্র্য হ্রাসকরণের গতিশীলতা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। এই ঝুঁকির মাত্রাকে সহনশীল পর্যায়ে অথবা মোকাবিলার পর্যায়ে নিয়ে আসতে না পারলে দারিদ্র্য হ্রাসকরণের গতি থমকে যেতে পারে বা উল্টোপথেও প্রবাহিত হতে পারে। ব্র্যাকের 'গ্র্যাজুয়েশন অ্যাপ্রোচ' এখন পর্যন্ত যথাসাধ্যভাবে এই ঝুঁকিগুলোকে সময়মতো এবং সঠিকভাবে চিহ্নিত করে মাঠপর্যায়ের কার্যক্রমে সেগুলোকে মোকাবিলা করা ও সদস্যদের মধ্যে সহনশীলতা তৈরি করার উদ্যোগকে অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছে। কিন্তু ঝুঁকির মাত্রা এবং পরিধি বেড়ে যাওয়ার সঙ্গেসঙ্গে 'গ্র্যাজুয়েশন অ্যাপ্রোচ'-কেও নতুন আঙ্গিকে চিন্তা করা জরুরি হয়ে পড়েছে।

এক্ষেত্রে আমাদের আরেকটি বিষয় মনে রাখতে হবে। দারিদ্র্যের মতো ঝুঁকিও বহুমুখী। ঝুঁকি শুধুমাত্র জলবায়ু পরিবর্তন, নগরায়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সকল দারিদ্র্য বিমোচন এবং উন্নয়ন কমর্সূচির মধ্যেও আরেক ধরনের ঝুঁকি প্রায় নীরবে লুকিয়ে থাকে। কোনো মানুষের অবস্থার পরিবর্তন কখনও কখনও তার জন্য নতুন ঝুঁকিও বয়ে নিয়ে আসতে পারে। এমনকি 'গ্র্যাজুয়েশন' প্রক্রিয়ার মাধ্যেমেও এই ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ অতিদরিদ্র মানুষকে অর্থনৈতিক ঝুঁকি সম্পর্কে অবহিত না করে তাদেরকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করলে তা তাদের জীবনে নানা মাত্রার দুর্যোগ বয়ে আনতে পারে। অধিকতর ঝুঁকি মানে অর্জনের সক্ষমতা হ্রাস করার সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেওয়া। কাজেই যে কোনো কর্মসূচির মধ্যেই উদ্ভূত ঝুঁকিকে চিহ্নিত করে তাকে মোকাবিলা করা এবং তার প্রতি সহিষ্ণুতা তৈরি করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। ব্র্যাকের চলমান দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে আমরা গভীরভাবে অনুধাবন করেছি যে, অতি বড় ঝুঁকি মোকাবিলাকে কর্মসূচিতে পুরোপুরি সম্পৃক্ত করতে হলে তার ফলাফল যেন টেকসই হয়, সেটির ওপর আমাদের জোর দিতে হবে। টেকসই সাফল্য অর্জন করার সূচকগলোকে দারিদ্র্য বিমোচন প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে অধিকতর শক্তিশালী করতে হবে।

সুতরাং সামগ্রিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে 'গ্র্যাজুয়েশন'-কে এককভাবে অতি সরল সমাধান না ভেবে বরং একে দারিদ্র্য বিমোচনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা দরকার। দারিদ্র্য হ্রাসকরণের জন্য গ্র্যাজুয়েশন অ্যাপ্রোচকে আমরা সাধারণত একটি দ্বিমাত্রিক প্রায়োগিক অবকাঠামো হিসেবে চিন্তা করে থাকি, যা কর্মসূচির সময়কাল এবং কর্মসূচির মাধ্যমে যে সেবা প্রদান করা হয়, সেগুলোকে নির্দেশ করে। কিন্তু অনিশ্চিত ঝুঁকিকে এই অবকাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হলে সময়ের প্রয়োজনে কিছু নতুন এবং মৌলিক উপাদান নানা মাত্রায় গ্র্যাজুয়েশন কর্মসূচির সামগ্রিক কার্যক্রমে সন্নিবেশিত করতে হবে। এর ফলে কিছু নির্দিষ্ট কার্যক্রম দীর্ঘায়িত হয়ে এগুলোর সময়কাল প্রলম্বিত হবে, এই অনুধাবনের ওপর ভিত্তি করে 'গ্র্যাজুয়েশন' প্রক্রিয়াকে দ্বিমাত্রিক থেকে ত্রিমাত্রিক একটি অবকাঠামোয় নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। এই কাঠামোর তৃতীয় মাত্রাটি হলো ঝুঁকি মোকাবিলা করার জন্য প্রলম্বিত সময়, যেখানে নানা উপাদানকে ব্যবহার করে কর্মসূচির কিছু কার্যক্রমকে আরও গভীরতর এবং শক্তিশালী করে তোলা হবে। এর ফলে কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের প্রথম পর্যায় থেকেই সদস্যদের মধ্যে একদিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঝুঁকি সহনশীলতা তৈরি হতে থাকবে। অন্যদিকে কোনো দুর্যোগ ঘটলে তখন কর্মসূচি নিবিড় সহায়তা প্রদান করার মাধ্যমে সদস্যদের সেই ঝুঁকি টেকসইভাবে কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করতে সক্ষম হবে। এভাবে গ্র্যাজুয়েশন কর্মসূচিতে একটি তৃতীয় মাত্রা যোগ করা গেলে তা 'দারিদ্র্য হ্রাস' ও 'দারিদ্র্য বিমোচন'-এর মধ্যে একটি অবদানমূলক সংযোগ সেতু তৈরি করবে। তবে এক্ষেত্রে

ছবি: প্রণব ঘোষ, ব্র্যাক

দারিদ্র্য নিরসন কখনই সহজসাধ্য কাজ নয়। ব্র্যাকের গ্র্যাজুয়েশন অ্যাপ্রোচ সময়মতো এবং সঠিকভাবে দারিদ্র্য ঝুঁকিগুলোকে মোকাবিলা এবং এতে অংশগ্রহণকারী পরিবারগুলোর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি সহনশীলতা তৈরির উদ্যোগ নিতে সক্ষম হয়েছে

বলা ভালো যে, যত দ্রুততার সঙ্গে আমরা ঝুঁকি মোকাবিলা করতে গিয়ে গৃহীত প্রলম্বিত কার্যক্রমগুলোকে আবারও মূল 'গ্র্যাজুয়েশন' প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে এসে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সদস্যদের কর্মসূচি থেকে গ্র্যাজুয়েট করতে পারব, ততই এই ত্রিমাত্রিক কাঠামোটি শক্তিশালী ও কার্যকর হবে।

গ্র্যাজুয়েশন অ্যাপ্রোচের ত্রিমাত্রিক কাঠামোর কার্যকারিতা তৈরি হওয়াটা ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ বা অনাগত ঝুঁকির আগাম চিহ্নিতকরণের সক্ষমতার সঙ্গেও সরাসরি সম্পৃক্ত। যত সঠিকভাবে আগাম ঝুঁকি চিহ্নিত করা যাবে, ততই 'গ্র্যাজুয়েশন'-এর তৃতীয় মাত্রার জন্য পরিকল্পিত পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হবে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা গড়ে তোলার পাশাপাশি আমাদেরকে অন্যদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার মানসিকতাও বাড়াতে হবে। এর মাধ্যমে আমরা 'গ্র্যাজুয়েশন অ্যাপ্রোচ'-কে আরও সময়োপযোগী ও সহিষ্ণু করে তুলতে পারব। আমরা ইতিমধ্যেই নানা গবেষণা এবং মূল্যায়ন থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখেছি, আলট্রা-পুওর গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের ফলে দারিদ্র্য থেকে বের হয়ে আসা মানুষ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের ৭ বছর পরেও তাদের উন্নয়নের ধারা টেকসইভাবে বজায় রাখতে পেরেছেন। সাম্প্রতিক সময়ে ক্রমবর্ধমান ঝুঁকির সংখ্যা এবং মাত্রাকে কার্যকরভাবে মোকাবিলা করতে পারলে আমরা নিশ্চয়ই আরও টেকসই এবং প্রজন্মগতভাবে ত্বরান্বিত দারিদ্র্য থেকে মুক্ত হতে পারব। এর একটি অন্যতম সাম্প্রতিক উদাহরণ হলো কয়েক মাস আগে সুনামগঞ্জসহ কয়েকটি হাওরভিত্তিক জেলায় ঘটে যাওয়া বন্যার সময় ব্র্যাকের আলট্রা-পুওর গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রামের কার্যক্রম। সে সময় প্রোগ্রামের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক, স্বল্পমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করার মাধ্যমে আমরা প্রলম্বিত এবং দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম গ্রহণ করি এবং সদস্যদের দুর্যোগ মোকাবিলা করা, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা, পুনরায় আয়উপার্জন শুরু করার মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা বিষয়ে নিবিড় সহায়তা প্রদান করি। এই কার্যক্রমগুলো কিন্তু গ্র্যাজুয়েশন অ্যাপ্রোচের মূল কাঠামোর মধ্যে বিস্তারিতভাবে সন্নিবেশিত ছিল না। পরিস্থিতি অনুযায়ী এগুলো আমরা গ্রহণ করেছি। পাশাপাশি নতুন, প্রলম্বিত এবং গভীরতর সহায়তা প্রদান করার পরও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সদস্যরা যেন কর্মসূচি থেকে বের হয়ে যেতে পারেন, সেটি নিশ্চিত করতেও আমরা প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। ফলে যে অতিরিক্ত কাজগুলো আমাদের সে সময় করতে হয়েছিল, সেগুলোকে আমরা মূল গ্র্যাজুয়েশন প্রক্রিয়ার মধ্যেও নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। এটিই গ্র্যাজুয়েশনের ত্রিমাত্রিক কাঠামো। আমরা এতদিন পর্যন্ত যখন প্রয়োজন হয়েছে, তখন ঝুঁকি মোকাবিলা কার্যক্রম শুরু করা হবে, এই অনুশীলন সকল দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমে করে এসেছি। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে গ্র্যাজুয়েশনসহ যে কোনো দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমে এটিকে মূল ডিজাইনের মধ্যে নিয়ে এসে কর্মসূচির একদম শুরু থেকে ঝুঁকি মোকাবিলা করার কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

দারিদ্র্য থেকে ক্রমান্বয়ে বের হয়ে আসাকে যদি একটি প্রক্রিয়ার মতো চিন্তা করি, তাহলে যে কোনো প্রকল্প বা কর্মসূচিকে সুচিন্তিতভাবে এবং প্রয়োজনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে নকশা প্রণয়ন করতে হবে, যেখানে অংশীদারত্বমূলক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। সামাজিক ক্ষমতায়নও খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রতি বছর ব্র্যাকের পক্ষ থেকে আলট্রা-পুওর গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা প্রায় ৭০ হাজার পরিবারকে দারিদ্র্য থেকে বের হয়ে আসতে সহায়তা প্রদান করি। আমরা তাদেরকে আরও সময়োপযোগী সহায়তা প্রদান করতে চাই, যাতে তারা শুধুমাত্র তাদের জীবনকালে নয় বরং এই ঝুঁকিপূর্ণ পথচলাকে মোকাবিলা করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পথচলাকেও আরও সুগম করতে পারেন। ২০৩০ সাল নাগাদ এই স্বল্প সময়ে, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কার্যক্রমকে দারিদ্র্য বিমোচনে উত্তরণের ক্ষেত্রে 'গ্র্যাজুয়েশন অ্যাপ্রোচ' উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে, গ্র্যাজুয়েশন অ্যাপ্রোচ-এর ২০ বছর পূর্তিতে ব্র্যাকের পক্ষ থেকে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার। ■

পলাশ দাশ
পরিচালক
আলট্রা-পুওর গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রাম, ব্র্যাক

প্রবন্ধ

সমতামুখী ও টেকসই উন্নয়নের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন দারিদ্র্য মোকাবিলা

ড. ইমরান মতিন

ভূমিকা

১৯৯০-এর দশক থেকে বাংলাদেশে দারিদ্র্য ক্রমাগতভাবে হ্রাস পাচ্ছে এবং দারিদ্র্যের হার ২০০০ সালে ৪৮% থেকে ২০১৬ সালে ২৪%-এ নেমে এসেছে। এখানে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। 'বাংলাদেশ সমন্বিত খানা জরিপ' (বিআইএইচএস) থেকে কয়েক বছরের তথ্য সংগ্রহ করে আহমেদ ও অন্যান্য (২০২১) দেখিয়েছেন, ২০১১-১২ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সময়কালে দেশের গ্রামীণ জনগণের মাত্র ২.৫% মানুষ স্থায়ী দারিদ্র্যের শিকার ছিলেন। অন্যদিকে এই গ্রামীণ জনগণের ২৩.৬% মানুষ অস্থায়ী দারিদ্র্যের শিকার ছিলেন অর্থাৎ নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্য তারা দারিদ্র্যের মধ্যে ছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় বাংলাদেশে দারিদ্র্য প্রধানত অস্থায়ী বা অন্তর্বর্তীকালীন, স্থায়ী বা ধারাবাহিক নয়।

দারিদ্র্য নিরসনের গতিশীলতায় এই পরিবর্তন অবশ্যই উৎসাহব্যঞ্জক। তবে একইসঙ্গে এই পরিস্থিতি দরিদ্র নয় এমন জনগোষ্ঠীর বিরাট একটি অংশের অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা এবং জীবন-জীবিকার অনিশ্চয়তার বিষয়টিকেও তুলে ধরছে, যারা বিভিন্ন ধাক্কার কারণে আবার দরিদ্র হয়ে যেতে পারেন। দারিদ্র্যসীমার ওপরে থাকা ঝুঁকিপূর্ণ এই জনগোষ্ঠীকে টেকসই ভিত্তিতে কীভাবে দারিদ্র্যর বাইরে রাখা যায়, সেটিই দ্বিতীয় প্রজন্মের দারিদ্র্যবিষয়ক চ্যালেঞ্জ, যা আমাদের মোকাবিলা করতে হবে।

দরিদ্র নয় এমন পরিবারগুলোর দরিদ্র হয়ে পড়ার এই বাস্তবতার মূলে আছে নানা ধরনের বিমাহীন ঝুঁকি। এসব ঝুঁকির মধ্যে অসুস্থতা, জীবিকা হারানো ও মৃত্যু পারিবারিক পর্যায়ে প্রভাবিত করে। আবার সামষ্টিক ঝুঁকির মধ্যে আছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব, খরা, জমির উর্বরতা হ্রাসের মতো বিষয়াদি। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সামষ্টিক ঝুঁকিগুলো আরও গুরুতর হয়ে উঠেছে, যা অস্থায়ী দারিদ্র্য মোকাবিলাকে কঠিন করে তুলছে। সুসংহত সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি ও বিমা ব্যবস্থার অনুপস্থিতি ভবিষ্যতে এ ধরনের ঝুঁকি দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধি ও মানব উন্নয়ন কার্যক্রমে গুরুতর প্রভাব ফেলবে।

কোভিড-১৯ আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতি ও সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতাগুলোকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। মহামারি আমাদের নাগরিকদের সামষ্টিক ও পারিবারিক উভয় ধরনের ঝুঁকির মুখোমুখি করেছে এবং দারিদ্র্যসীমার ওপরে থাকা পরিবারগুলোর একটি বড় অংশকে দারিদ্র্যসীমার নিচে ঠেলে দিয়েছে। এই লেখাটিতে কোভিড-১৯-এর উদাহরণকে সামনে রেখে জটিল কোনো সংকট মোকাবিলায় জীবিকা পুনরুদ্ধারের জন্য বিশেষায়িত পরিকল্পনা প্রণয়নের চ্যালেঞ্জগুলো সম্পর্কে আমি আলোচনা করছি।

কোভিড-১৯ ও নতুন দরিদ্র

পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি) এবং ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিআইজিডি) যৌথভাবে শহরের বস্তি এবং গ্রামে একাধিক পর্বের একটি জাতীয় সমীক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে দারিদ্র্যের ওপর কোভিড-১৯-এর প্রভাব নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে। ২০২০ সালের এপ্রিলে প্রথম লকডাউনের সময় সমীক্ষাটির প্রথম পর্ব পরিচালনা করে আমরা দেখতে পাই যে, ঝুঁকিতে আছে তবে দরিদ্র নয় এমন পরিবারগুলোর মধ্যে ৭৭% অর্থনৈতিক আঘাতে দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে গেছে। এদেরকে আমরা 'নতুন দরিদ্র' বলছি। যাদের আয় দারিদ্র্যসীমার ওপরে তবে জাতীয় গড় আয়ের নিচে তাদের আমরা ঝুঁকিতে আছে তবে দরিদ্র নয় এমন পরিবার হিসেবে চিহ্নিত করছি। আয়ের ক্ষেত্রে আরেকটি অনাকাঙ্ক্ষিত প্রভাব আমরা দেখতে পেয়েছি। যদিও দরিদ্র পরিবারগুলো মহামারির আগের গড় আয়ে আবার ফিরতে সক্ষম হয়েছে, নতুন দরিদ্রদের আয় এখনও করোনার আগের গড় আয়ের অনেক নিচে রয়ে গেছে। দুই বছর পরও আমাদের জরিপের নতুন দরিদ্রদের বিরাট একটি অংশ এখনও দারিদ্র্যসীমার নিচেই অবস্থান করছে। বাইরের সহায়তা ছাড়া এই পরিবারগুলোর স্থায়ীভাবে দরিদ্র হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা দারিদ্র্য নিরসনে আমাদের অগ্রগতিকে সামগ্রিকভাবে পিছিয়ে দেবে।

নতুন দরিদ্রদের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের ধারায় ফেরানোর উপায়

বন্যা, খরা বা মহামারির মতো সংকটের সময় ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীকে ন্যূনতম কল্যাণসীমার নিচে নেমে যাওয়া থেকে রক্ষায় এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব থেকে সুরক্ষিত রাখতে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ভূমিকা অনস্বীকার্য। আমাদের দেশের জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে (হাসান. এম. কে, ২০১৭)। তবে কোভিড মহামারি আমাদের বিদ্যমান সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার অনিবার্য ফাঁকগুলোকে স্পষ্ট করে দিয়েছে।

কোভিড পরবর্তী সময়ে সরকার আনুষ্ঠানিক এবং রপ্তানিমুখী খাতকেন্দ্রিক নানা প্রণোদনামূলক প্যাকেজ ঘোষণা করেছে (মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ ও সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, ২০২২)। এ ছাড়াও একদফা অর্থ সহায়তা এবং খোলা বাজারে বিক্রির মাধ্যমে খাদ্যে ভর্তুকিও দেওয়া হয়েছে (উল্লিখিত)। তবে এগুলো পরিমাণ ও মাত্রা উভয় দিক থেকেই খুবই অপ্রতুল ছিল। আমাদের সমীক্ষায় খুব স্বল্পসংখ্যক মানুষ সরকার থেকে কোনো সহায়তা প্রাপ্তির কথা বলেছেন, আর যারা পেয়েছেন তাদের প্রাপ্ত সহায়তা আয়ের ক্ষতির তুলনায় খুবই নগণ্য।

অর্থনৈতিকভাবে ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর সুরক্ষায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক উপাদান হলো কার্যকর ক্রেডিট মার্কেট, অর্থাৎ সচল ঋণ প্রাপ্তির ব্যবস্থা। অর্থায়ন কার্যক্রম ঝুঁকিপূর্ণ থাকায় অনেক ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা মহামারিকালে নিজেদের কার্যক্রম সীমিত করে এনেছিল। অতীতের বড় বড় দুর্যোগের অভিজ্ঞতার আলোকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দেশে ১৯৯৮ সালে অনেক প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং বন্যায় গ্রামীণ ব্যাংকের এক-চতুর্থাংশ ঋণগ্রহীতা ঋণখেলাপি হয়ে পড়েন (দৌলা, ২০১৭)। মোজাম্বিক ও মধ্য আমেরিকার মতো অন্যান্য দেশেও দুর্যোগকালে ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাগুলোর একই অভিজ্ঞতা হয়েছে (উল্লিখিত)। ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাগুলো সাধারণত সংকটকালে ঋণ পরিশোধে কঠিন শর্ত আরোপ করে (কালরান ও মুলিয়ানাথন, ২০০৭)। এ ধরনের সীমাবদ্ধতার কারণে দুর্যোগকালে এসব সংস্থা থেকে পরিবারগুলোর ঋণ নেওয়ার সামর্থ্য আরও কমে আসে। তখন এসব পরিবার

ছবি: প্রণব ঘোষ, ব্র্যাক

সাম্প্রতিক বছরগুলোর পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় বাংলাদেশের দারিদ্র্য প্রধানত অস্থায়ী বা অন্তর্বর্তীকালীন। এর কারণ দেশের দারিদ্র্যসীমার ওপরে থাকা জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ অর্থনৈতিকভাবে ভঙ্গুর। যেকোনো বড় ধাক্কায় তারা দরিদ্র হয়ে পড়ে। এই জনগোষ্ঠীকে টেকসইভাবে দারিদ্র্যমুক্ত করা দারিদ্র্য নিরসনে বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ

অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ নিতে বাধ্য হয়, যার সুদহার অস্বাভাবিক রকমের বেশি (দৌলা, ২০১৭)। এর ফলে তারা গভীরতর দারিদ্র্যের দিকে ধাবিত হয়।

২০২২ সালের মে মাসে পরিচালিত আমাদের এই জরিপের সর্বশেষ ধাপে দেখা গেছে যে, অংশগ্রহণকারীদের অর্ধেকই ঋণ নিতে পারেনি। এর মূল কারণ আগে থেকে নেওয়া ঋণের বোঝা ও ঋণশোধে অক্ষমতা। পরিবারগুলো এ সময় বেঁচে থাকার ন্যূনতম চাহিদা মেটাতে হিমশিম খাচ্ছিল। পরিবারের ওপর ঋণের বোঝা বৃদ্ধির যে দাবি করা হয়েছে, তার স্বপক্ষে এই জরিপে আমরা প্রমাণ পেয়েছি।

নতুন দরিদ্র বিষয়ে ব্র্যাকের পদক্ষেপ

নতুন দরিদ্র পরিবারগুলোকে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে সহায়তার লক্ষ্যে ২০২১ সালে ব্র্যাক 'নতুন দরিদ্র' কার্যক্রম চালু করে। সময়মতো সহায়তা প্রদান করা এই কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ব্র্যাকের আলট্রা-পুওর গ্র্যাজুয়েশন (ইউপিজি) এই কর্মসূচি পরিচালনা করছে। ইউপিজি কর্মসূচি চলমান রয়েছে এমন ৩৫টি জেলার ৪৪৬টি কার্যালয়ের মাধ্যমে ১ লাখ ১১ হাজার ৫শ নতুন দরিদ্র পরিবারকে সহায়তা প্রদান এই কর্মসূচির লক্ষ্য।

'নতুন দরিদ্র' কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত উপাদানগুলো হচ্ছে-আয়মূলক কাজ চিহ্নিত করা বা ব্যবসার পরিকল্পনা প্রণয়ন, আয়মূলক উদ্যোগ বা ব্যবসার জন্য ঋণদান, সঞ্চয়ের বিপরীতে সঞ্চয় সহায়তা, বিলম্বে ঋণশোধের সুবিধা, দক্ষতা প্রশিক্ষণ এবং বাড়িতে গিয়ে আয়মূলক উদ্যোগ ব্যবস্থাপনায় পরামর্শ সহায়তা দেওয়ার মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করা। নতুনভাবে দারিদ্র্য-জর্জরিত এই জনগোষ্ঠীকে প্রয়োজনীয় 'ধাক্কা' দেওয়া এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য, যাতে তারা দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে এসে নতুনভাবে জীবন-জীবিকা শুরু করতে পারে।

কর্মসূচির সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের কারণে এতে সাফল্য এসেছে। প্রথমত, বিশেষায়িত টার্গেটিং এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। পার্টিসিপেটরি রুরাল অ্যাপ্রাইজাল (পিআরএ) ও ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশনের (এফজিডি) মাধ্যমে উপযুক্ত অংশগ্রহণকারীকে দ্রুত চিহ্নিত করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এই কর্মসূচির আওতায় ঋণ গ্রহণের শর্ত শিথিল করা হয়েছে। ব্র্যাকের মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচির ঋণগ্রহীতাকে ঋণের পরিমাণের ৫-২০% জমা রাখতে হয়, যা এই কার্যক্রমে রাখা হয়নি।

'বিশ্বাস' এই কর্মসূচির সফলভাবে ঋণ প্রদানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কর্মসূচি ও অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা গড়ে তোলায় কেন্দ্রীয় ভূমিকা ছিল কর্মসূচির মাঠপর্যায়ের কর্মীদের। তাদের প্রথম কাজ ছিল পূর্ণ মনোযোগ সহকারে অংশগ্রহণকারীদের কথা শোনা এবং তাদেরকে সংকট থেকে পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা তৈরিতে সহায়তা করা।

অবশেষে এই কার্যক্রম প্রারম্ভিক ঋণ কর্মসূচি হিসেবে কাজ করেছে, যা উল্লিখিত পরিবারগুলোকে প্রাথমিক স্তরের ঋণগ্রহীতা হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ মার্কেটে প্রবেশের জন্য তৈরি করেছে। যেসব ঋণগ্রহীতা নতুন দরিদ্র কর্মসূচিতে সফলভাবে ঋণ পরিশোধে সক্ষম হন, তাদের ব্র্যাকের মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচিতে স্থানান্তর করা হয়। তারা তখন ব্র্যাক থেকে আরও বড় আকারের ঋণ ও অন্যান্য আর্থিক সেবার সুযোগ লাভ করেন।

উপসংহার

ব্র্যাকের নতুন দরিদ্র ধরনের কর্মসূচি কোভিড মহামারির ফলে তৈরি হওয়া অর্থনৈতিক সংকট থেকে পুনরুদ্ধারে নিয়ামকের ভূমিকা রাখতে সক্ষম। বিআইজিডি এই কার্যক্রমটির প্রভাব পরিমাপ করার জন্য এবং এ থেকে পাওয়া শিক্ষাগুলোকে সুস্পষ্টভাবে বোঝার লক্ষ্যে একটি মিশ্র পদ্ধতির গবেষণা পরিচালনা করছে। এ গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ কিছু ফলাফল বেরিয়ে আসবে বলে আমরা আশা করছি, যা ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্যোগ কাটিয়ে উঠে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণে সহায়ক হবে। এ ছাড়া এসব ফলাফল সামগ্রিকভাবে অন্তর্বর্তীকালীন বা অস্থায়ী দারিদ্র্য দূরীকরণে দিক্‌নির্দেশনা দেবে বলেও আমাদের প্রত্যাশা। ■

ড. ইমরান মতিন
নির্বাহী পরিচালক
বিআইজিডি, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি

তথ্যসূত্র

- Ahmed, A. U., & Tauseef, S. (2022). Climbing up the ladder and watching out for the fall: poverty dynamics in rural Bangladesh. Social Indicators Research, 160(1), 309-340.
- Cabinet Division and the General Economics Division. (2022). 'Social Protection in Bangladesh: A Common Narrative'. Cabinet Division and the General Economics Division, Planning Commission, Government of Bangladesh. Available: *https://socialprotection.gov.bd/en/2022/04/02/social-protection-in-bangladesh-a-common-narrative/*
- Dowla, A. (2018). Climate change and microfinance. Business Strategy & Development, 1(2), 78-87.
- Hasan, M. K. (2017). ABCD of Social Protection in Bangladesh. Cabinet Division and General Economics Division, Planning Commission, Government of Bangladesh.
- Karlan, D., & Mullainathan, S. (2007). Is microfinance too rigid. Financial Access Initiative Concept Note.

প্রবন্ধ

বাংলাদেশে উদ্ভাবিত গ্র্যাজুয়েশন অ্যাপ্রোচ আজ সারা বিশ্বের সম্পদ

শামেরান আবেদ

দীর্ঘমেয়াদে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা এবং সামাজিক ক্ষমতায়ন-এই বিশ্বাস নিয়ে গত ৫০ বছর ধরে ব্র্যাক কাজ করে চলেছে। এখন পর্যন্ত আমরা সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে অনেক উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও মডেল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, তার ফলাফলের ভিত্তিতে বিস্তৃত আকারে দেশে-বিদেশে প্রসারিত করেছি। এর মধ্যে অন্যতম 'গ্র্যাজুয়েশন অ্যাপ্রোচ' যা দুই দশক আগে ব্র্যাক অতিদরিদ্র নারী ও তাদের পরিবারকে টেকসই উন্নয়নে সহায়তা করার লক্ষ্য নিয়ে উদ্ভাবন করে। বাংলাদেশে মডেলটির বাস্তবায়ন শুরু হয় টার্গেটিং দ্য আলট্রা-পুওর প্রোগ্রাম (বর্তমানে পরিবর্তিত নাম আলট্রা-পুওর গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রাম)-এর মাধ্যমে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী গ্র্যাজুয়েশন অ্যাপ্রোচ অতিদারিদ্র্য বিমোচনের একটি কার্যকর মডেল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিশ্বের প্রায় ৫০টি দেশে সরকার, বেসরকারি সংস্থাসহ বিভিন্ন অংশীদার গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করছে। গ্রামীণ অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী ছাড়াও শহরাঞ্চলের বস্তিতে বসবাসকারী, প্রতিবন্ধিতা, যুদ্ধবিদ্ধস্ত বা শরণার্থী জীবন, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবসহ বিভিন্ন কারণে প্রবল ঝুঁকির মধ্যে থাকা জনগোষ্ঠীও এই কর্মসূচিগুলোতে অংশ নিচ্ছে। মডেলটির কার্যকারিতা বহুবিধ গবেষণাতেও প্রমাণিত হয়েছে।

গ্র্যাজুয়েশন অ্যাপ্রোচ উদ্ভাবনের প্রেক্ষাপট

ব্র্যাকের এই মডেলটির উদ্ভাবন সংস্থার অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষা গ্রহণের একটি ভালো উদাহরণ। সত্তরের দশকে ব্র্যাক ও অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থা বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক পন্থা হিসেবে বিস্তৃত পরিসরে আধুনিক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করে। আশির দশকে দরিদ্র মানুষের সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্র্যাকের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য কর্মসূচিরও প্রসার ঘটতে থাকে। ১৯৮৭ সালে ব্র্যাক জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি) ও বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে সমন্বিতভাবে ইনকাম জেনারেশন ফর ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (আইজিভিজিডি) কর্মসূচি শুরু করে, যার মূল লক্ষ্য ছিল একটি নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী খাদ্য সহায়তা, প্রশিক্ষণ ও কাজের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামীণ অতিদরিদ্র নারীদের দারিদ্র্য থেকে উত্তরণে সহায়তা করা। এভাবে দারিদ্র্য বিমোচনে সরাসরি বা পরোক্ষ সহায়তামূলক বহুবিধ কার্যক্রম পরিচালনার পরও নব্বইয়ের দশকে ব্র্যাক অনুধাবন করে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে চরম দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত কিছু জনগোষ্ঠী অংশ নিতে পারছে না এবং তারা নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থাকেন বিধায় এ কর্মসূচি তাদের জন্য পুরোপুরি কার্যকর নয়। অন্যদিকে আইজিভিজিডি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী প্রান্তিক নারীরা স্বল্পমেয়াদে সুফল ভোগ করলেও তাদের একটি বড় অংশের জীবনে দীর্ঘমেয়াদে এই কর্মসূচি কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না। সামগ্রিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে ব্র্যাক উপলব্ধি করে অতিদরিদ্র এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সমস্যার ধরন ও চাহিদাও বহুমাত্রিক হয়। 'কোনোমতে খেয়ে পরে বেঁচে থাকার মতো অর্থ উপার্জন' করা ছাড়াও সীমিত সম্পদ, দুর্গম অঞ্চলে বসবাস, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, সরকারি-বেসরকারি সেবায় অভিগম্যতা না থাকা-এরকম নানা ধরনের বৈশিষ্ট্যের কারণে এই জনগোষ্ঠীগুলো জীবনভর একটি দারিদ্র্যচক্রের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। তাদের মধ্যে দক্ষতার স্বল্পতা ও আত্মবিশ্বাসের প্রবল অভাব থাকে। ফলে তারা নিজ প্রচেষ্টায় এই দুষ্টচক্রকে ভেঙে পরিবারের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারে না।

ব্র্যাক আরও উপলব্ধি করে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীগুলোর বহুমাত্রিক সমস্যা ও চাহিদা অনুযায়ী তাদের জন্য সহায়তার ধরনও হওয়া চাই বহুমাত্রিক। এই উপলব্ধির ওপর ভিত্তি করেই ব্র্যাক অতিদরিদ্র মানুষের জীবনমানের টেকসই উন্নয়ন ঘটাতে কী ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা যায়, সে বিষয়ে কাজ করতে শুরু করে। এর ফলেই 'গ্র্যাজুয়েশন অ্যাপ্রোচ' উদ্ভাবন। বাংলাদেশে পরিচালিত ব্র্যাকের গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রাম-এর মাধ্যমে আমরা এ পর্যন্ত ৪৮টি জেলার প্রায় ২২ লাখ পরিবারকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত হতে সহায়তা করেছি। ২০০৭ সালে লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স-এর গবেষকবৃন্দ এই কর্মসূচির ওপর রেনডোমাইজড কন্ট্রোল ট্রায়াল পদ্ধতি প্রয়োগের ভিত্তিতে একটি বিস্তৃত গবেষণাকর্মে যুক্ত হন। তাদের গবেষণায় দেখা গেছে, দু'বছর মেয়াদি এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী পরিবারগুলোর ৯৩ শতাংশ ৭ বছর পরেও নিজেদের ধারাবাহিক উন্নতি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী প্রসার

ব্র্যাক উদ্ভাবিত গ্র্যাজুয়েশন অ্যাপ্রোচ বিশ্বব্যাপী প্রসারিত হওয়াটাও ছিল অনেক ঘটনাবহুল। ব্র্যাক বাংলাদেশে আলট্রা-পুওর গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রাম শুরু করার কয়েক বছরের মধ্যেই এর সফলতা বৈশ্বিক অংশীদারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে সে সময় অনেকে মনে করেছিলেন 'গ্র্যাজুয়েশন অ্যাপ্রোচ' বাংলাদেশে কাজ করার মূল কারণ এটি একটি জনবহুল দেশ এবং এখানে ব্র্যাকের মতো একটি সংস্থা আছে, যারা বিস্তৃত পরিসরে কাজ করে। জনবসতি অনেক কম বা ব্র্যাকের মতো এত বড় সংস্থা যেখানে নেই, সেসব দেশে এর বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এ সময় বিশ্বব্যাংকের অঙ্গ সংগঠন কনসালটেটিভ গ্রুপ টু অ্যাসিস্ট দ্য পুওর (সিজিএপি) এগিয়ে আসে। ২০০৬ সালে সিজিএপি আরেক আন্তর্জাতিক সংস্থা ফোর্ড ফাউন্ডেশনকে সঙ্গে নিয়ে যৌথভাবে গ্র্যাজুয়েশন অ্যাপ্রোচের সর্বজনীনতা অর্থাৎ মডেলটি অন্যান্য দেশের প্রেক্ষাপটেও কার্যকর কিনা তা পরীক্ষার উদ্যোগ নেয়। ২০০৬ থেকে পরবর্তী কয়েক বছরে ভারত, পাকিস্তান, হাইতি, হন্ডুরাস, ইথিওপিয়া, পেরু, ইয়েমেন ও ঘানা এই আটটি ভিন্ন ভৌগোলিক ও জনবৈচিত্র্যের দেশে ১০টি পাইলট প্রকল্প পরিচালনা করা হয়, যাতে ১৯টির মতো সংস্থাকে যুক্ত করা হয়। এগুলোর মধ্যে কয়েকটি দেশে ব্র্যাক কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। এই কর্মসূচিগুলোর ওপর পরিচালিত গবেষণার

ছবি: প্রণব ঘোষ, ব্র্যাক

গবেষণায় প্রমাণিত গ্র্যাজুয়েশন অ্যাপ্রোচের আওতায় দু'বছর মেয়াদি কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া পরিবারগুলোর ৯৩ শতাংশ সাত বছর পরও নিজেদের ধারাবাহিক উন্নতি বজায় রাখতে পেরেছে। এই কর্মসূচি দেশের ৪৮ জেলার প্রায় ২২ লাখ পরিবারকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত হতে সহায়তা করেছে

ফলাফলে দু'য়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া বাকি সবগুলো ক্ষেত্রেই দেখা যায়, প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী পরিবারগুলো খাদ্য নিরাপত্তা, শিশুপুষ্টি সুরক্ষা, সম্পদ ও সঞ্চয়ের মতো প্রধান আর্থসামাজিক উন্নয়ন সূচকগুলোতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেছে।

২০০৯ সালে ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে আফগানিস্তানে গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রাম শুরু হয়। এর মধ্য দিয়েই বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে গ্র্যাজুয়েশন অ্যাপ্রোচের বাস্তবায়ন শুরু করে ব্র্যাক। পরবর্তীকালে বিশ্বব্যাপী গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রামের সম্প্রসারণ ঘটানো এবং সরকারসহ বিভিন্ন অংশীদারকে গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রাম ডিজাইন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করার লক্ষ্যে ২০১৬ সালে ব্র্যাক আলট্রা-পুওর গ্র্যাজুয়েশন ইনিশিয়েটিভ-এর যাত্রা শুরু হয়। এখন পর্যন্ত আফগানিস্তান, পাকিস্তান, দক্ষিণ সুদান, উগান্ডা এবং লাইবেরিয়াতে সরাসরি গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করেছে ব্র্যাক। পাশাপাশি ভারত, হাইতি, কেনিয়া, মিশর, ফিলিপাইনসহ বিভিন্ন দেশে সরকারসহ অন্যান্য অংশীদারদের নিজ দেশের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তা প্রদান করেছে।

বিশ্বের সম্পদ 'গ্র্যাজুয়েশন অ্যাপ্রোচ'

গ্র্যাজুয়েশন অ্যাপ্রোচ এখন আর বিশেষ কোনো প্রতিষ্ঠান বা দেশের সম্পত্তি নয়। আজ তা সারা বিশ্বের সম্পদ। বিশ্বব্যাপী এই মডেল সম্প্রসারণে আজ ব্র্যাকের পাশাপাশি সরকার, দাতা সংস্থা, জাতীয় ও স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা, ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিমালিকানা খাত ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান অংশীদার হিসেবে কাজ করছে। ফলে এর বাস্তবায়নের পরিসর ক্রমশ আরও বাড়ছে।

এক্ষেত্রে গ্র্যাজুয়েশন অ্যাপ্রোচের উদ্ভাবক এবং গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের সর্বোচ্চ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সংস্থা হিসেবে আমরা সংশ্লিষ্ট সকল অংশীদারের জন্য বলতে চাই, গ্র্যাজুয়েশন অ্যাপ্রোচের মূল কাঠামো-জীবিকা উন্নয়ন, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন-এই চারটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। লক্ষিত জনগোষ্ঠীর জীবনে দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই পরিবর্তন আনতে এর প্রত্যেকটি স্তম্ভই অপরিহার্য। সেজন্য চারটি স্তম্ভকে সমুন্নত রেখে স্থানীয় প্রেক্ষাপট ও যে জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে, তাদের আর্থসামাজিক বাস্তবতা অনুযায়ী কর্মসূচির কার্যক্রম নির্ধারণ এবং কর্মসূচি ডিজাইন করতে হবে। এগুলোর কোনো একটিকে বাদ দিয়ে গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রাম ডিজাইন করলে তা দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল নিশ্চিত করতে পারবে না। অন্যদিকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারদের হাতে সময় আছে আর মাত্র আট বছর। এই সময়ের মধ্যে টেকসই লক্ষ্যমাত্রা-১ 'দারিদ্র্য বিলোপ' অর্জন কোনো দেশের সরকার বা অন্য কোনো অংশীদারের একক প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সরকারি নীতি, কর্মসূচি ও সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমে গ্র্যাজুয়েশন অ্যাপ্রোচের অভিযোজন করা হলে তা বিস্তৃত পরিসরে দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করায় সহায়ক হবে।

ব্র্যাক জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে সরকারসহ অন্যান্য নীতিনির্ধারক অংশীদারদের সঙ্গে এ বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেক দেশের সরকার গ্র্যাজুয়েশন অ্যাপ্রোচকে তাদের দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত নীতি এবং কার্যক্রমে গ্রহণ করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে ফিলিপাইন, পাকিস্তান, রুয়ান্ডা ও দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার গ্র্যাজুয়েশন অ্যাপ্রোচকে অভিযোজন করে তাদের জীবিকায়ন এবং সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালি করার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি ফল অর্জনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অন্যদিকে অপরিকল্পিত নগরায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমে নিত্য নতুন সংকট তৈরি করছে। ব্র্যাকসহ নানা স্টেকহোল্ডাররা এই প্রেক্ষাপটে সফলতার সঙ্গে গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, তাকে ব্যবহার করে নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমানের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সরকার, বেসরকারি সংস্থাসহ সকল স্টেকহোল্ডারকে সম্মিলিতভাবে কাজ করে যেতে হবে। ■

শামেরান আবেদ
নির্বাহী পরিচালক
ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনাল

ব্র্যাকের ৫০ বছরের অভিযাত্রায়
দারিদ্র্য দূরীকরণে গ্র্যাজুয়েশন কৌশল অগ্রযাত্রার ২০ বছর

১৯৭২

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ব্র্যাক ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ শুরু করে।

১৯৭০ দশকের শেষ ও ১৯৮০ দশকের শুরু

ব্র্যাক দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করে। অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচি শুরু করা হয়। পাশাপাশি ব্র্যাক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচিও হাতে নেয়।

১৯৮৫

বাংলাদেশ সরকার পরিচালিত ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (ভিজিডি) কর্মসূচিতে ব্র্যাক সহযোগী সংস্থা হিসেবে যুক্ত হয়। এই কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল নিম্নআয়ভুক্ত পরিবারের নারীদের দারিদ্র্যমুক্তিতে সহায়তা করা।

১৯৮৭

ভিজিডি কর্মসূচির সাফল্য বৃহত্তর পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি এবং ব্র্যাকের যৌথ উদ্যোগে ইনকাম জেনারেশন ফর ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (আইজিভিজিডি) কর্মসূচি শুরু হয়। এর লক্ষ্য ছিল সুবিধাবঞ্চিত পরিবারসমূহের খাদ্য চাহিদা মেটাতে সহায়তা করার তাদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান।

১৯৯০ দশক

ব্র্যাক উপলব্ধি করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা সবচাইতে প্রান্তিক ও দরিদ্রতম, তারা মাইক্রোফাইন্যান্স এবং আইজিভিজিডিসহ অন্যান্য মূলধারার উন্নয়ন কার্যক্রমের সুবিধা গ্রহণ করতে পারছে না। ব্র্যাক এই জনগোষ্ঠীগুলোকে আলট্রা-পুওর হিসেবে অভিহিত করে এবং এদের জন্য বিশেষায়িত দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচি ডিজাইন করতে শুরু করে।

২০০২

বাংলাদেশে ব্র্যাক 'চ্যালেঞ্জিং দ্য ফ্রন্টিয়ার্স অব পভার্টি রিডাকশন-টার্গেটিং দি আলট্রা-পুওর' (সিএফপিআর-টিইউপি) শীর্ষক একটি গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়। কর্মসূচিটি ব্র্যাকের নব উদ্ভাবিত দারিদ্র্য বিমোচন মডেল 'গ্র্যাজুয়েশন অ্যাপ্রোচ'-কে কেন্দ্র করে ডিজাইন করা হয় যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সর্বাঙ্গীণ সহায়তা প্রদান করা হয়। ফলে অতিদরিদ্র পরিবারের সদস্যদের সম্পদ, কর্মদক্ষতা এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়ে তাদের দারিদ্র্যমুক্তি এবং দীর্ঘমেয়াদে মানসিক ও আর্থসামাজিক অবস্থার টেকসই উন্নয়ন ঘটে।

২০০৬

বাংলাদেশে আলট্রা-পুওর গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রামের সাফল্য বৈশ্বিক অংশীদারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারা গ্র্যাজুয়েশন অ্যাপ্রোচকে ব্যবহার করে অন্যান্য দেশেও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্য অবস্থা থেকে উত্তরণে সহায়তা করা সম্ভব কিনা তা যাচাইয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে। এই লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাংকের কনসালটেটিভ গ্রুপ টু অ্যাসিস্ট দ্য পুওর (সিগ্যাপ) এবং ফোর্ড ফাউন্ডেশন-এর যৌথ উদ্যোগে বিশ্বের ৮টি দেশে ১০টি পরীক্ষামূলক গ্র্যাজুয়েশন প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়। ব্র্যাক এই প্রকল্পগুলোর কয়েকটিতে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে।

২০০৭

বাংলাদেশে সিএফপিআর-টিইউপি কর্মসূচির টার্গেটিং প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী করার মধ্য দিয়ে পরবর্তী ৫ বছরকে লক্ষ্য করে কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু হয়।

২০০৯

ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনাল আফগানিস্তানে গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রাম শুরু করে। এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্র্যাকের সরাসরি গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের সূচনা হয়।

২০১০

সিএফপিআর-টিইউপি প্রোগ্রাম তার কার্যক্রমকে নগরের প্রেক্ষাপটে বিস্তৃত করে। ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনাল পাকিস্তানে গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন শুরু করে।

২০১২

সিএফপিআর-টিউপি প্রোগ্রামের তৃতীয় পর্যায় শুরু হয়। কর্মসূচির এই নতুন পর্যায়টিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা এবং এর প্রতি সহিষ্ণুতা তৈরির লক্ষ্যে একটি কৌশল গ্রহণ করা হয়।

২০১৩

দক্ষিণ সুদানে ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনাল গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রাম শুরু করে। এটি আফ্রিকা মহাদেশে ব্র্যাকের প্রথম সরাসরি বাস্তবায়িত গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রাম।

২০১৫

গ্র্যাজুয়েশন অ্যাপ্রোচ বাংলাদেশে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে স্বীকৃতি লাভ করে। বাংলাদেশ সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং গ্র্যাজুয়েশন মডেল দারিদ্র্য বিমোচনের একটি কার্যকর মডেল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

২০১৬

বৈশ্বিক অংশীদারদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান আগ্রহ এবং বিভিন্ন দেশে পরিচালিত গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রামের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ব্র্যাক 'আলট্রা-পুওর গ্র্যাজুয়েশন ইনিশিয়েটিভ' গঠন করে। এর লক্ষ্য ছিল পদ্ধতিগত কারিগরি সহযোগিতা প্রদান ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে গ্র্যাজুয়েশন অ্যাপ্রোচের বাস্তবায়ন কার্যক্রমকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া। বাংলাদেশে টার্গেটিং দ্যা আলট্রা-পুওর প্রোগ্রামের চতুর্থ পর্যায় শুরু হয় এবং জাতীয় পর্যায়ে পলিসি ও কার্যক্রমে গ্র্যাজুয়েশন অ্যাপ্রোচকে অভিযোজিত করার লক্ষ্যে অ্যাডভোকেসি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

২০১৭

গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রামের চার মূল স্তম্ভ- জীবিকা উন্নয়ন, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, সামাজিক সুরক্ষা এবং সামাজিক ক্ষমতায়ন-এর গুরুত্ব এবং কার্যকরিতাকে বিশেষ বিবেচনায় নিয়ে আলট্রা-পুওর গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রামের কৌশল এবং বাস্তবায়ন পদ্ধতি-কে আরও শক্তিশালী করা হয়। আলট্রা-পুওর গ্র্যাজুয়েশন ইনিশিয়েটিভ কেনিয়াতে জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দু'টি শুষ্কপ্রবণ অঞ্চলে সরকার গৃহীত দু'টো পাইলট প্রকল্পে কারিগরি সহযোগিতা দিতে শুরু করে।

২০১৮

বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলায় রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় গ্রহণের প্রেক্ষিতে জেলার স্থানীয় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবিকার উন্নয়ন এবং সেখানে সামাজিক সংহতি রক্ষার লক্ষ্যে ব্র্যাক একটি বিশেষ গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রাম শুরু করে। ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনাল লাইবেরিয়ায় একটি গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রামের সরাসরি বাস্তবায়ন এবং আলট্রা-পুওর গ্র্যাজুয়েশন ইনিশিয়েটিভ মিশর ও ফিলিপাইনে দু'টি গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রাম পরিচালনায় কারিগরি সহযোগিতা প্রদান শুরু করে।

২০১৯

বাংলাদেশে টার্গেটিং দ্যা আলট্রা-পুওর প্রোগ্রামের নতুন নামকরণ করা হয় 'আলট্রা-পুওর গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রাম'। উগান্ডার ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনাল ডিজেবিলিটি ইনক্লুসিভ গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রাম শুরু করে। এটি ব্র্যাকের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের জন্য পরিচালিত প্রথম গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রাম।

২০২০

আলট্রা-পুওর গ্র্যাজুয়েশন ইনিশিয়েটিভ মর্যাদাপূর্ণ অডেশাস প্রোজেক্ট শীর্ষক পুরস্কার অর্জন করে। এর প্রেক্ষিতে আলট্রা-পুওর গ্র্যাজুয়েশন ইনিশিয়েটিভ আফ্রিকা ও এশিয়াভুক্ত দেশগুলোর সরকারের মাধ্যমে গ্র্যাজুয়েশন অ্যাপ্রোচ বিস্তারের লক্ষ্যে একটি কৌশল নির্ধারণ করে।

২০২১

আলট্রা-পুওর গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রামের পঞ্চম পর্যায়ে এসে সারাদেশব্যাপী বিস্তৃত পরিসরে গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের পাশাপশি নানা প্রেক্ষাপট এবং ভিন্ন ভিন্ন ঝুঁকির মধ্যে বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রাম ডিজাইন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় শহরাঞ্চলে বসবাসরত, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অভিবাসনকারী, প্রতিবন্ধী ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়াও ব্র্যাকের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কর্মকৌশলের অংশ হিসেবে বাংলাদেশে 'নতুন দরিদ্র কর্মসূচি' বাস্তবায়ন শুরু হয়। এই কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল কোভিড অতিমারির প্রভাবে দরিদ্র হয়ে পড়া মানুষের ভবিষ্যতে এ ধরনের ঝুঁকি মোকাবিলার সামর্থ্য অর্জনে সহায়তা প্রদান।

২০২২

ব্র্যাক বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি এবং অন্যান্য দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমে গ্র্যাজুয়েশন অ্যাপ্রোচকে অভিযোজন এবং নীতিনির্ধারক পর্যায়ে অংশীদারত্ব ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে আরও জোরদার করে। ব্র্যাক ও ইউএনডিপি কৌশলগত অংশীদারত্বে যুক্ত হয়। পাশাপাশি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আরও নিবিড় সহযোগিতা বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়। উগান্ডায় ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনাল প্রাক্‌শৈশব প্রোগ্রাম এবং গ্র্যাজুয়েশন অ্যাপ্রোচকে একত্রিত করে একটি সমন্বিত কার্যক্রম শুরু করে। এটি শরণার্থী এবং শরণার্থী শিবির যে এলাকায় অবস্থিত, সেখানকার স্থানীয় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী – উভয়ের জন্য ব্র্যাক পরিচালিত প্রথম গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রাম।

২০২৩ এবং তারপর

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তন, নগরায়ন এবং আকস্মিক ও বারবার দুর্যোগের মতো ঘটনায় দারিদ্র্য বিমোচনের গতি সারা বিশ্ব জুড়েই উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে। এর ফলে উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাতে পারছে না। বাড়ছে বৈষম্য। ব্র্যাক এসব নতুন বাধা অতিক্রমের লক্ষ্যে বৃহৎ পরিসরে গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রামের বাস্তবায়ন, গ্র্যাজুয়েশন অ্যাপ্রোচকে অভিযোজিত করার মাধ্যমে সরকারের ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-১ অর্জনে অর্থাৎ বিশ্বকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে কার্যকর অংশীদারত্ব ও সহযোগিতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাবে। ■

নির্বাচিত উদ্ধৃতি

মানুষের নিজের হাতেই থাকে তার ভাগ্য পরিবর্তনের চাবিকাঠি। কিন্তু দারিদ্র্য ও আর্থসামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারণে অনেকে তার মধ্যে অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার বিকাশ ঘটাতে পারে না, যা ভাগ্য পরিবর্তনে তাকে সহায়তা করবে। সেজন্য যার প্রয়োজন সবচাইতে বেশি তার পাশে আশার শক্তি হয়ে দাঁড়াতে হবে।

উন্নয়নের এই মূল দর্শনকে সঙ্গী করে ব্র্যাক প্রান্তিক মানুষের সম্ভাবনা বিকাশের সুযোগ তৈরি করার জন্য কাজ করে চলেছে। আমরা বিশ্বাস করি, দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত যে মানুষ, তার মধ্যে একবার যদি আত্মবিশ্বাস তৈরি করে দেওয়া যায়, তাহলে তিনি নিজ প্রচেষ্টায় দারিদ্র্য থেকে মুক্ত হয়ে সমাজে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান তৈরি করে নিতে পারেন। ব্র্যাক সেজন্য নানা উদ্ভাবনী টুলস ব্যবহার করে অতিদরিদ্র মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি করে দেওয়ার জন্য কাজ করে চলেছে। এ ধরনের কাজের মধ্যে অন্যতম হলো ব্র্যাকের দারিদ্র্য বিমোচন মডেল 'গ্র্যাজুয়েশন অ্যাপ্রোচ'।

বাংলাদেশে উদ্ভাবিত এবং ব্র্যাক গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে বাস্তবায়িত এই মডেলটি আজ বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতি ও প্রসার লাভ করেছে। বর্তমানে বিভিন্ন দেশের সরকারসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডাররাও গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করছে। অনেকেই তাদের নিজ দেশের প্রেক্ষাপটে এই মডেলের বাস্তবায়নে সহায়তা চেয়ে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। গ্র্যাজুয়েশন অ্যাপ্রোচের এই সাফল্য একদিকে গর্বের, অন্যদিকে তা ব্র্যাকের দায়িত্বকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

এরই ধারাবাহিকতায় আমরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সরকারসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে সমন্বিতভাবে দারিদ্র্য প্রকট এলাকায় বসবাসরত এবং বহুমাত্রিক সমস্যায় জর্জরিত জনগোষ্ঠীর সম্ভাবনা বিকাশের মাধ্যমে দারিদ্র্য ও বৈষম্যমুক্ত বিশ্ব নির্মাণের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছি। গ্র্যাজুয়েশন অ্যাপ্রোচের ২০ বছর পূর্তিতে ব্র্যাকের পক্ষ থেকে এই উদ্যোগকে আরও কার্যকর, ফলপ্রসূ এবং সম্প্রসারিত করে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

আসিফ সালেহ্
নির্বাহী পরিচালক, ব্র্যাক

উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতার একটি অনন্য উদাহরণ হলো ব্র্যাকের অতিদরিদ্র কর্মসূচি আলট্রা-পুওর গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রাম। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বাংলাদেশে শুরু হওয়া এ কর্মসূচি ৫০টিরও বেশি দেশে সম্প্রসারিত করেছে ব্র্যাক। কর্মসূচিটি ইতিমধ্যে লাখ লাখ অতিদরিদ্র মানুষের জীবন বদলে দিয়েছে আর নীতিনির্ধারকদের হাতে-কলমে দেখিয়েছে কী করে সমাজের সবচেয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা যায়। ব্র্যাকের অংশীদার হিসেবে প্রকল্পটিকে সফল করতে পেরে ভীষণভাবে গর্বিত যুক্তরাজ্য সরকার। সেইসাথে ব্র্যাককে তার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে অভিনন্দন জানাই এবং আশা রাখি ভবিষ্যতে আমরা উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে একসঙ্গে কাজ করে যাব।

ম্যাট ক্যানেল
উন্নয়ন বিষয়ক পরিচালক, ব্রিটিশ হাইকমিশন, ঢাকা

“ দারিদ্র্য বিমোচনের প্রক্রিয়া, বিশেষ করে চরম বঞ্চনার শিকার জনগোষ্ঠীর জন্য, একটি দীর্ঘ পরিক্রমা। বিগত দুই দশক ধরে ব্র্যাক আলট্রা-পুওর গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশ এবং অন্যত্র বসবাসরত জনগোষ্ঠীর বঞ্চিত ও সহায়-সম্বলহীন নারী ও তাদের পরিবারদের চিহ্নিত করে জীবনমানের উন্নয়ন ঘটাতে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

অতিদারিদ্র্য থেকে উত্তরণের পদ্ধতি উদ্ভাবনে ব্র্যাক পথিকৃৎ-এর ভূমিকা পালন করেছে। ব্র্যাকের দৃষ্টান্ত এখন বিশ্বব্যপী জনকল্যাণমূলক ও সেবাদানকারী সংস্থাসমূহের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। বিগত ২০ বছর ধরে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বার্থে টেকসই জীবিকায়ন ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমে ব্র্যাকের অগ্রযাত্রায় অংশীদার হতে পেরে অস্ট্রেলিয়া গর্বিত। ”

নার্ডিয়া সিম্পসন
ডেপুটি হাই কমিশনার, অস্ট্রেলিয়ান হাই কমিশন

“ আলট্রা-পুওর গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে গত বিশ বছর ধরে ব্র্যাক বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অতিদারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই এবং মানুষের জীবন আমূল পাল্টে দেওয়ার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ২০ লাখেরও বেশি নারীকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা নিজেরাই নিজেদের, পরিবারের, সর্বোপরি নিজ জনগোষ্ঠীর জীবন পরিবর্তনের অগ্রদূত হয়ে উঠতে পারেন। কৌশলগত অংশীদার হিসেবে ব্র্যাক এবং এর গ্র্যাজুয়েশন কর্মসূচিতে সহায়তা প্রদান করতে পেরে কানাডা গর্বিত। আন্তর্জাতিক সহায়তার ক্ষেত্রে কানাডার নারীবাদী নীতি-কৌশলের আওতায় সর্বাধিক ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে নারী ও শিশুর ক্ষমতায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়, যার সঙ্গে অতিদারিদ্র্য দূরীকরণে ব্র্যাকের কার্যক্রম অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ। ”

জো গুডিংস
উন্নয়ন সহযোগিতা বিষয়ক প্রধান, বাংলাদেশস্থ কানাডিয়ান হাইকমিশন

“ এ বছর শুরুর দিকে বিশ্বের বৃহত্তম বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক তার ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন করেছে। আবার এ বছরই ব্র্যাকের আলট্রা-পুওর গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রাম ২০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে। নিঃসন্দেহে এ এক দুর্দান্ত অর্জন। সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন এবং অতিদারিদ্র্য দূরীকরণে ব্র্যাকের অভূতপূর্ব প্রভাব সম্পর্কে জানতে এর জন্মস্থান বাংলাদেশ থেকে দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, একটি দৃষ্টান্ত দিয়েই এ সম্পর্কে বলতে পারি আমি। ২০১৯ সাল থেকে জাতিসংঘ শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনার (ইউএনএইচসিআর) কক্সবাজার জেলায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে আলট্রা-পুওর গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করে আসছে। কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী ৯৭% পরিবার সাফল্যের সঙ্গে অতিদারিদ্র্য অতিক্রম করেছে এবং তাদের মাথাপিছু আয় ২০০%-এরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন নিয়মিত সঞ্চয়ের পাশাপাশি টেকসই জীবিকা অর্জনে সহায়ক উৎপাদনশীল সম্পদেরও মালিক হয়েছেন তারা।

গ্র্যাজুয়েশন কৌশল ক্ষুধা ও দারিদ্র্য থেকে মুক্ত পৃথিবী গড়তে মানবিক সহায়তা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে জড়িতদের জন্য গভীর অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে। ইউএনসিএইচআর-এর ‘পভার্টি অ্যালিভিয়েশন কোয়ালিশন’-এর অন্যতম সদস্য হিসেবে ব্র্যাক দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে, তার কার্যক্রম মাতৃভূমি থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হওয়া মানুষ এবং তাদের মানবিক আশ্রয়দাতা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য আশার আলোকবার্তা বয়ে নিয়ে এসেছে। ”

ইয়োহানেস ভন ডার ক্লাও
প্রতিনিধি, জাতিসংঘ শরণার্থীবিষয়ক হাই কমিশনার (ইউএনএইচসিআর)

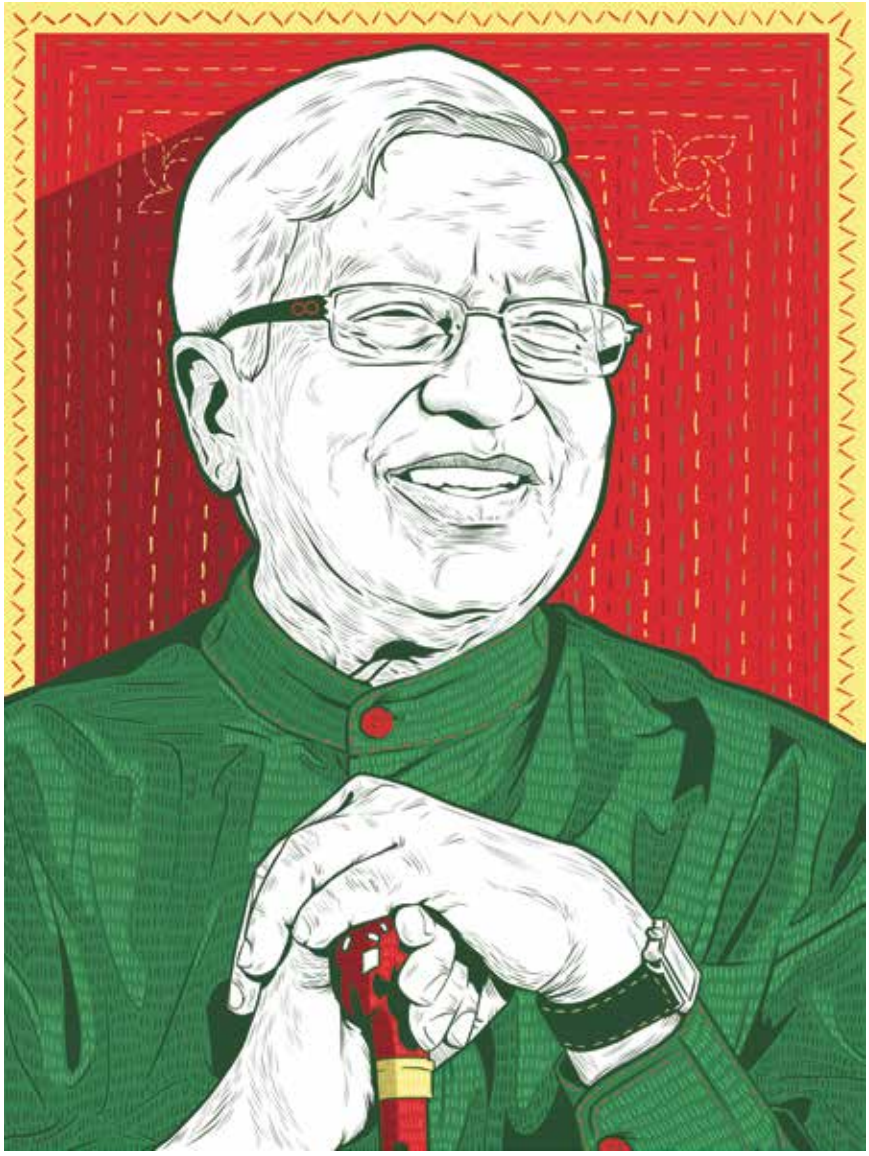

স্কেচ: মোরশেদ মিশু

“দীর্ঘ সময় ধরে মানুষ বিশ্বাস করে এসেছে দারিদ্র্য স্রষ্টা কর্তৃক আরোপিত ভাগ্যলিখন। চন্দ্র-সূর্যের মতো ভাগ্যকেও পরিবর্তন করা যায় না। কিন্তু এটা শুধুই একটা মিথ। বাস্তব প্রমাণের দিকে দৃষ্টি ফেরানো উচিত আমাদের। এসব প্রমাণ আমাদের বলে দেয়, মানুষের মাঝে আশা ও আত্মমর্যাদাবোধের সঞ্চার একটি দেশের জন্য মানবপুঁজিতে সর্বশ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ হয়ে উঠতে পারে।”

স্যার ফজলে হাসান আবেদ, প্রতিষ্ঠাতা, ব্র্যাক

প্রকাশনায়

brac

প্রকাশনা সহযোগী

বণিকবার্তা